বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড,
৩৩, কলেজ রো । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ

৩৩, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

শ্রীহরি প্রেস

১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :

শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী

অন্যান্য চিত্র :

শ্রীঅলোক ধর

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

লেখাগুলো সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক বসুমতী, শারদীয় আনন্দবাজার, গণবার্তা, ধ্বনি এবং কালি ও কলম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। অপরিবর্তিত ও অপরিবর্ধিত অবস্থায় এ-গুলো গ্রন্থিত হলো।

এ-পুস্তকে বর্ণিত কাহিনী, চরিত্র, ইত্যাদি সবই কাল্পনিক।

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য-ব্যতিরেকে এ-বই প্রকাশিত হতো না। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওঙ্কার গুপ্ত

সহধর্মিণী ও ‘সহমর্মিণী’ অর্চনাকে—

পুণ্যতীর্থে

"আপনি কোনারক যাচ্ছেন?" খেতে বসে হঠাৎ প্রশ্ন করে লোকটি। আজ তিনদিন হলো এসেছি, পাশা-পাশি ঘরে থাকি, কিন্তু এই প্রথম বাক্যালাপ।

"যাবার ইচ্ছে আছে।"

"টিকিট কেটেছেন?"

"ম্যানেজারকে বলেছি।"

"এই ম্যানেজার, ম্যানেজার। ঠাকুর, ম্যানেজারকে ডাকো তো। এই, ধনিয়া, ম্যানেজারকে ডাক, ব্যাটা। ডাক, ডাক ডাকছন্তু!" চিৎকার করে ওঠে ও।

"এই যে, ম্যানেজার। আপনি এঁর কোনারকের টিকিট কেটেছেন?"

"না। বলে রেখেছি। আজ সন্ধ্যেয় কাটবো।" মিনমিন করে বলে ম্যানেজার।

"যাক, আর কাটতে হবে না। উনি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।" একেবারে শেষ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলো ও। তারপর একমুঠো মৌরলা মাছ মুখে পুরে দু' একবার চিবিয়েই চিৎকার করে উঠলো : "কাঁচা কাঁচা, স্রেফ কাঁচা! এ কোন মড়ার হোটেলে এসে মরলাম রে, বাবা! একটুও তেল দেয় নি। ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার বাবুকে বলো এসব খাওয়ালে আজই আমরা চলে যাবো। সালা, আজ সাতদিন হয়ে গেল, রোজ চেল্লাচ্ছি, তবু কেউ কান করে না! মাছগুলো হয় পচা নয় কাঁচা, সব ডালের টেস্ট এক, চাটনি না আটাগোলা, মোটা চালের ভাত—ভূ-ভারতে এমন হোটেল আর দেখিনি রে বাবা! এমন হারামি মালিকও আমার নজরে পড়ে নি। দাদাকে তখনই বললুম—।"

"আরে, আমি কি ছাই এতোটা ভেবেছি!" মুখ খুললো স্থূলকায় আবলুশ কাঠ ভাইয়ের শীর্ণকায় বেলকাঠ দাদা। "আগের বারে এতো জঘন্য দেখিনি। তখন তো মালিক সেবাদাসী জোটায় নি। এখন সব কনট্রোল যে নতুন গিন্নীর হাতে;" মিহিগলায় বলে ও।

"ঠাকুর ব্যাটাও তেমনি নচ্ছার।", বললো আবলুশ কাঠের আলুভাতেমার্কা বউ। "কতোবার বললুম আমার নাড়ুগোপালের জন্যে আব একটুখানি আলুভাতে দাও। ও মা! ব্যাটা কানেই তুললো না!"

"এ ভূতের দেশে না আসাই উচিত, জানলে বৌদি। সব করুছন্ত, হউছন্ত করবে। ম্যাগো! আব খাবার-দাবার যা ছিরি!" বলে তার চালকুঁমড়ো ঠাকুরঝি।

"আর কন ক্যান, মশয়। আমারে ভোগা দিয়া সেদিন সমুদ্রের মাছ খাওয়াইল অনেকগুলি। আইজও সারল না প্যাটের অসুখ। ঔষধে-পথ্যে কম পয়সা লাগল? সব অ্যাদের নষ্টামি!" বলে ডিসপেপটিক ব্যাংক সুপারভাইজার।

"আমাদেরই ভুল জানেন—এ-সব জায়গায় আসাটাই ভুল। মাসীকে তখনই বললুম—তা শুনলে না। হতো আমাদের কলকাতা—মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতুম ব্যাটা হোটেলওলার।" বললো গাঁট্টা-গোঁট্টা সদ্য গোঁফের রেখা-ওঠা বাজে-শিবপুরের ছেলেটি।

"আমি কি জানি ছাই এ ক'বছরে এ-হোটেল একেবারে গোল্লায় গেছে। বছর তিনেক আগে যখন আমার আরেক বোনপোকে নিয়ে আসি তখন অনেক ভালো ছিলো। আমি বিধবা মানুষ—অতো খাবার-দাবার দিকে নজর নেই; কিন্তু বোনপোদের তো আছে। ওদের ভালো লাগার জন্যেই আসা। এবারে এখানে দেখছি সবই আলাদা—নতুন গিন্নীই সব পাল্‌টে দিয়েছে। হি হি হি হি-!…" রসিয়ে রসিয়ে বললো ডাঁটো চেহারার মাসীঠাকরুণ।

"আমি তো ঐ জন্যিতি, ভাই, এ ক'দিন নিজেই রান্না করে খেইছি। বাবু বলেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে, তাই কাল থেকে এদের [illegible]ানে। তা এ-খাওয়া আমার চলবে নি, বাবা। একবেলা [illegible]য়েই পেট ভুট-ভাট!" বললো বৃদ্ধ ভদ্র লোকের মাঝবয়েসী রাঁধুনীটি।

"শুধু খাওয়ার ব্যাপার হলেও কথা ছিল না। এদের ব্যাভারটাই যেন কেমন? ওপরের কোণের দিকের ভালো ঘরটা কিছুতেই দিলে না। একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলাম। 'কুক'কে নিয়ে এলাম ঐ জন্যে। ঘর দিলে একেবারে চ্যাংড়াদের পাশে—ট্যাকা দায়!" বললো 'কুকের' বৃদ্ধ বাবু।

"ম্যানেজার কেটে পড়েছে:!" গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বলে আবলুশ। "ব্যাটাচ্ছেলে! যাক্, আপনি মশাই আমাদের সঙ্গেই কাল কোনারক যাচ্ছেন। টাকা দেয়া থাকলে চেয়ে নিন ম্যানেজারের কাছ থেকে। ঐ দশ টাকায়ই হবে। আমরা

বায়োজন হচ্ছি, আপনাকে নিয়ে তের। একশো তিরিশ টাকা নিচ্ছে ড্রাইভার ব্যাণ্ডা।"

"তের? তা সংখ্যাটা ভালোই। বাসখানা দেখে নিয়েছেন তো—কতো বড়ো, মজবুত কি না, চলবে কি না—।" উঠতে উঠতে বললাম আমি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশাই। আজ তিনটেয় বাস নিয়ে আসবে। না বাজিয়ে আমরা কিছু করিনে। আমাদের পেনেটিতেই করিনে, আর এই উড়ের দেশে! হুঁ!"

"না হয় দরকার হলে একটু ঠেলবেন বাসখানা।" চিপটেন কাটে বেলকাঠ দাদা।

"ও ঠেলাঠেলির মইধ্যে নাই, মশয়। প্যাটের অসুখে দুর্বল হইয়া গেছি। আমার স্ত্রীর শরীরও ভালো নয়। দ্যাখবেন, নার্ভের উপর অত্যাচার না হয়।" বলে ব্যাংক সুপারভাইজার।

"আমার কুকের শরীরও ভাল নয়। রাস্তায় কোনো ঝামেলা না হয় দেখবেন।" বলে বৃদ্ধলোকটি।

"রাস্তায় খাবার-দাবার পাওয়া যাবে তো? আমি বিধবা মানুষ···আমার আর কি? একটু ভালো মাছ পেলেই হলো। গোপালের জন্যেই চিন্তা। গোপাল, তুই পারশেটা খাবিনে তালে, আমি নিলুম। তুই বরং ওপরে গিয়ে দুটো রসগোল্লা খেগে যা। গোপাল আমার নক্ষী!···"

"ও মশাই, উঠুন, উঠুন। আর কতো ঘুমুবেন!" প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভাঙলো। "কুম্ভকর্ণের কাজিন নাকি, মশাই। বেলা সাড়ে ছ'টা—আমাদের দুবার খাওয়া হয়ে গেল। এক্ষুণি বাস এসে পড়বে। বাস এলে আমরা দাঁড়াবো না। উঠুন, উঠুন।" দরজা খুলে বাইরে আসতেই···"নিন, নিন, পাইখানা, চান, সব সেরে ফেলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কী হলো, ঘুমটা কাটছে না

বুঝি? দেখুন, বাস এসে গেল। নিন চটপট তৈরী হয়ে। কইরে, তোরা সব কোথায় গেলি—ভূতো, গেঁড়ি, ন্যাংচা, গুয়ে? যা, যা সব নীচে যা। দাদা···!"

"ধনিয়া, চা দাও!" আমিও আবলুশের মতো হাঁক পাড়ি।

"এই রে, এখন চা খাবেন, তারপর বুঝি প্রাতঃকেত্য। ভালেই হয়েছে! টাকাটা দিন, মশাই!"

আমি বিধবা মানুষ, অতো খাবার-দাবার দিকে নজর নেই।—

"সব সময়ে হবে। ধনিয়া!" সমুদ্র গর্জন ছাপিয়ে ওঠে আমার গলা। আমি নিজেই অবাক হই। চলে যায় আবলুশ।

প্রাতঃকৃত্য সারতে সারতেই নীচে থেকে হাঁক শুনি: কী হলো, দাদা? সাতটা বেজে গেল। ড্রাইভার ব্যাটা আর দাঁড়াতে চাইছে না। ছেড়ে দেবে যে। শীগগির আসুন।—

দাড়ি কামিয়ে, চান করে, পোষাক পরে নীচে গিয়ে যখন বাসের সামনে দাঁড়ালাম বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

"ওঃ আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েছেলের বাড়া। এদিকে এই সালা ড্রাইভার কী তাগিদই দিচ্ছে। যাক, দয়া করে উঠে পড়ুন চটপট—এই যে, এখানে, ড্রাইভারের পাশে।"

একখানা স্টেশন ওয়াগন। পেছনের সীটে দুইভায়ের দুই বউ, বোন, আর ব্যাংক-সুপারভাইজরের বউ। গুটি তিনেক বাচ্চা। মাঝের সীটে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তাঁর "কুক", মাসী-বোনপো, আবলুশ আর ব্যাংক সুপারভাইজর, আর গোটা চারেক বাচ্চা। ড্রাইভারের পাশে তার ক্লীনার, বড়োভাই, আর একটি ছোকরা, আর···আমি।

"কী হলো, উঠছেন না যে? হাণ্ডিল মারছে—উঠুন, উঠুন।"

"আমাকে কি সামনে বসতে হবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"জায়গা কোথায়?"

"ঐ তো, করে নিন কোনোরকমে।"

"আপনারা তো প্রায় পঁচিশজন লোক দেখছি।"

"আরে, বাচ্চাদের কথা ছেড়ে দিন। নিন, উঠুন।"

জানলার ধারে বড়োভাই, তারপর ছোকরাটি, তারপর আমি। আমার এক ঠ্যাং গেলো গীয়ারের তলায় আর এক ঠ্যাং ছোকরার গায়ে।

"নিন, টাকাটা দিন এবারে।" বাস চলতেই বড়ো ভাইয়ের দাবী। দিলাম টাকা।

"এ্যাই, ড্রাইভার, কতোক্ষণ লাগবে যেতে?" জিজ্ঞেস করে বড়োভাই।

"কোথায় যেতে?"

"আরে, ব্যাটা, যেখানে যাচ্ছিস।"

"যাচ্ছি তো অনেক জায়গায়।"

"আমাদের আইটেনেরারি কী, বলুন তো?" জিজ্ঞেস করি আমি।

জবাব দেয় না কেউ। পাশে-বসা ছোকরাটিকে হোটেলে ফটফট করে ইংরেজী বলতে শুনেছি, তাকেই জিজ্ঞাসা করি এবারে।

"আমরা টুরিস্ট।" জবাব দেয় ছোকরা। ছোকরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি ?" আবার জিজ্ঞেস করি।

"ও হরি! তাও জানেন না," বলে বেলকাঠ। "আমরা প্রথমে যাচ্ছি সাক্ষিগোপাল, তারপর কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, লিঙ্গরাজ, চিলকা—"

"চিলকা নয়।" প্রতিবাদ করে ড্রাইভার।

"কেন, চিলকা নয় কেন।"

"একশো তিরিশ টাকায় চিলকা হেব ?"

"শুনেছিস, গেবো, আমরা নাকি চিলকা যাচ্ছিনে। কথা শুনেছিস ব্যাটার ?"

"না, আমরা চিলকা যাচ্ছিনে।" জবাব দেয় আবলুশ।

"ওমা সে কি গো! আমরা চিলকে যাচ্ছিনে! চিলকের মাছ নিয়ে আসবো ভেবেছিলুম যে গো।" নাকি সুরে বলে মাসী।

"আর চিলকা যেতে হবে না।" ধমকের সুরে বলে বোনপো।

"বাব্বা! কী ধমক! আচ্ছা, আচ্ছা—বাবা।

"চিলকে না গেলে তো একশো টাকায়ই হওয়া উচিত।" বলে বেলকাঠ।

"দশ টাকায় হেওয়া উচিত।" খুব সহজ করে বলে ড্রাইভার।

"আরে ব্যাটার কথা শোনো। চলো, বাবা জগড়নাথঅ, কোনো গোলমাল করুছন্তি, তো তোমাকে আমি দেখুছন্তি।"

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বাসসুদ্ধ হেসে উঠলো সবাই।

"এই, ড্রাইভার, বাঁধ, বাঁধ!" স্বর্গদ্বারের মুখে এসে চিৎকার করে আবলুশ। গাড়ি দাঁড়াতেই নেমে গেলো ও। একমিনিট,

ছু'মিনিট, পাঁচমিনিট···দশ মিনিট। এলো পুলিশ, করলো বচসা, টুকে নিলো গাড়ির নম্বর। এমন সময়ে আবলুশের আবির্ভাব, হাতে বড়ো বড়ো অনেকগুলো কলা।

"বাঞ্চোতের জায়গা, মশাই! পরশু যে কলা একটাকা ডজন কিনেছি, কাল তা নিয়েছে পাঁস্‌সিকে, আজ একেবারে ডেট্টাকা! আবার বলছে, তিনদিন বাদে আপনারাই কিনবেন তিনটাকা করে। দোষ সব আমাদেরই। আমরা মরতে আসি এই মড়ার দেশে।··· হ্যাঁ, এদিকে আবার কী হলো? পুলিশ কেন?"

"কেন আবার! আপনারই জন্যে। পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে এখন খেসারত দিতে হবে। কেতে ঝামেলা হেব!" বলে ড্রাইভার।

"ঝামেলা কী রে, ব্যাটা? চার গণ্ডা পওহা দিয়ে দিস। নে, চল, এখন।"

বাস একটু এগোতেই আবলুশ আবার চিৎকার করে ওঠে—"ওরে, বাঁধ, বাঁধ। পান নেয়া হয়নি।" ড্রাইভার চালিয়ে যায়। "কৈ রে, বাঁধ, পান নোবো।" ড্রাইভার তবু বাঁধে না। "এই ব্যাটা, শুনতে পাচ্ছিস্ নে? গাড়িটা বাঁধ—পান কিনবো।"

"এখানে বাঁধতে পারবো না। মন্দিরের সামনে তেল নেবো—ওখানেই বাঁধবো।"

"আরে পান কিনতে কি একগাদা সময় লাগবে? বাঁধ এখানেই।"

বাঁধলো না ড্রাইভার। আবলুশের কথা ওর কানেই ঢুকলো না।

"সাক্ষিগোপালে দেখনের কী আছে? সোজা কোনারক গ্যালেই তো হয়।" বলে ব্যাংক-সুপারভাইজর।

"দেখনের কোথায়ও কিছু নেই। শুধু নিয়মরক্ষে, বুঝলেন না।" জবাব দেয় বেলকাঠ দাদা।

"তা যা কইছেন। এই পুরী, এইখানের সমুদ্রের তো খুব নাম-ডাক। আচ্ছা, কন দেখি, মশয়, সমুদ্রের মইদ্যে কী আছে? মাইলের পর মাইল খালি জল আর জল।"

"আমারও তো ঐ কতা। তাজমহল নিয়ে তো মশাই, কতো কী হলো। আমি তো দেখেছি। কী এতো আহামরি, বুঝিনে।"

"সাক্ষিগোপালে ভালো মন্দির আছে।" বলে বাজেশিবপুরের মাসী।

"উড়িষ্যায় কোনো ভালো মন্দির নেই। মন্দির দেখতে হলে ম্যাড্রাস।" বলে কলকাতার গ্র্যাজুয়েট ছোকরা। এতোক্ষণে দেখতে পেলাম ওর হাতে একটি ট্রানজিসটর সেট। সর্বনাশ!

"ম্যাড্রাসের মন্দিরে রস নেই।" বলে বেলকাঠ।

"সাক্ষিগোপালের ছবি নিবি, গোপাল?" বলে মাসী।

"না, ছবি নেবো শুধু কোনারকের।" সিনেমা-কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলে গোপাল।

সাক্ষিগোপালে মেয়েরা মন্দিরের ভেতরে গেল। ছেলেদের একদল লাগলো পাণ্ডাদের সঙ্গে বচসায়, একদল গেল ডাব খেতে। শেষের দলে আমিও। ডাব খেয়ে পয়সা দিতে পারছে না কেউ—খুচরো নেই। সবগুলো দাম এক সঙ্গে করে আমিই দিয়ে দিলাম।

সাক্ষিগোপালের পাণ্ডারা বাস ধরে ঝুলতে ঝুলতে আধমাইল এলো। "মা, রাণীমা, অন্নপূর্ণা! ব্রাহ্মণকে এক সের চাল আর একপো ডালের পয়সা দাও। এক নয়া পয়সাও তোমরা মন্দিরের প্রণামী দিলে না।"

"ম্যা গো! ব্যাটারা ছিনে জোঁক গো! পাণ্ডাকে একটি পয়সা দিতে নেই, জানলে?" বলে বৃদ্ধের 'কুক'টি।

"এইগুলি অপদার্থ। তেমনি অপদার্থ এ্যাদের গরমেণ্ট। হইত আয়ুব খাঁর রাজত্ব।"

"সেখানে মোল্লাদের দাপট জানেন আপনি ?" বলেই ফেললাম।

"হ, হ, জানি, মশয়। চাবুক দিয়া সব ঠাণ্ডা কইরা দিছে।"

কোনারকে এসে ড্রাইভার বলে, এক ঘণ্টা সময়।

"কী, আমরা কি হুকুমের চাকর ? যতোক্ষণ খুশি দেরি করবো। ঐ জন্যে কোম্পানীর গাড়িতে আসিনি রে ব্যাটা। যাঃ যাঃ!" ধমক দেয় আবলুশ।

পাঁচটি হোটেলওলা ঘিরে ধরলো।

"ভালো চাল পাঁচ রকম, মাছ, ডাল, দুইটা তরকারি, ঘি, লেবু, চাটনি, কলাপাতা···সব—শুধু পাঞ্চ সিকি···"

"কী, মশাই, কোনটায় ?" জিজ্ঞেস করে আবলুশ।

"ঐ কোণেরটায় চলুন···নিরিবিলি আছে।"

"ঠিক হ্যায়। ঠাকুর আমরা মন্দির দেখে আসছি। বাচ্চাদের হাপ তো ?"

"হ্যাঁ, বাবু।"

একা একা মন্দির দেখছি। তেমন ভিড় নেই—বাঁচোয়া। একমনে দেখছি সপ্তাশ্ববাহিত রথ, রথের চাকা···একটা চিৎকারে ঘোরটা কাটলো। "ও মশাই, আমরা হোটেলে চল্লুম। তাড়াতাড়ি আসুন, যারা রইলো তাদের ডেকে নিয়ে আসবেন।" ঘড়িতে দেখি মোটে পনের মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। ধীরে-সুস্থে মন্দির দেখতে লাগলাম।

মিথুন-মূর্তির প্যানেলগুলোর সামনে আসতেই একটা খিলখিল হাসির শব্দ।

"তোর আর আশ মেটে না, গোপাল। আর কতো ছবি তুলবি ? আয় তোতে আমাতে একটা ছবি তুলি। হিঃ হিঃ হিঃ!" বাজে শিবপুরের মাসীর গলা। "কে তুলবে ছবি ?" · "কেন, ঐ যে সেই আমাদের মুখ-গোমড়া সায়েববাবু।" সর্বনাশ! পালাবার পথ নেই।

"হ্যাঁ ভাই, আপনি আমাদের একটা ছবি তুলে দেবেন ?"

ভগবান বাঁচালেন—পেছনে ট্রানজিসটরের আওয়াজ। "ঐ যে, ও তুলে দেবে।" পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু পেছনে না তাকিয়ে পারিনে—যা খিলখিল হাসির শব্দ। বোনপোকে জড়িয়ে ধরে মাসী একটা বড়ো যুগলমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে সস্ত্রীক ব্যাংক সুপারভাইজরের মুখোমুখি। "আরে, ছি ছি ছি, মশয়! এই সব অশ্লীল ব্যাপার এইখানে! এইসব মন্দির ভাইঙ্গা ফ্যালা উচিত। আগেই অবশ্য অনেক শুনছিলাম। পুরীতে ছ্যাখলামও। তবে পুরীর ব্যাপারটা ধর্মীয়। এইটা কী ? গরমেণ্টের উচিত এইগুলি ডিমলিশ করা।"

"করতে চেয়েছিলো তো। ১৯৩৭ সালের কংগ্রেস গাবমেণ্ট গান্ধীজীর মত চায়। গান্ধীজী জিজ্ঞেস করেন নন্দলাল বোসকে। নন্দলাল মত দেন না।"

পেছনে ট্রানজিসটারের আওয়াজ।

"এই মন্দিরটার নাম সান টেম্পল, না সেক্স—টেম্পল ?" জিজ্ঞেস করে ছোকরা।

"হ রে, ভাই, তাই তো কইতেছিলাম ভদ্রলোকরে। এ মন্দির গুঁড়াইয়া ছ্যায় না ক্যান। তা উনি কইলেন, একবার কথাও হইছিল। নন্দলাল বোসে আপত্তি করে।"

"নন্দলাল বোসটা আবার কে ? নেতাজীর বাবা ?"

পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই।

হোটেলে সবাই খাবারের অপেক্ষায় বসে।

"কী, মশাই, বেশ ভালো করে দেখেছেন তো সব ?" বেলকাঠ-দাদার প্রশ্নের বিন্দুতে যেন ক্লেদের সিন্ধু।

"এ আবার কী মন্দির! দেব-দেবী নেই।" বলে বৃদ্ধের "কুক।"
"দেব-দেবী নেই, ছ্যাবা-দেবী আছে। হেঁ হেঁ!" বলে বেলকাঠ।

"ও ঠাকুর, কদ্দুর? আর তো পারা যাচ্ছে না হে?" হাঁক দেয় আবলুশ।

পাতের ওপর স্থূর্যমন্দিরসদৃশ ভাত গোগ্রাসে গিলতে লাগলো সবাই। মহিলারা স্বল্পাহারী এ রকম একটা ছেলেমানুষী ধারণার নিরসন হলো এতোদিনে।

"শালারা কি কোনো রান্না জানে? এই তোমার সরু চাল? এ কি এঁচোড়? এমন নুন কোথায়ও দেখিনি। মাছ কই হে?"

মাছ নিয়ে ফাটাফাটি চরমে উঠলো। "দু বকম মাছ কেন? পাঁচ রকম বলেছিলে যে।"

"পাঁচ রকম দেয় না কেউ। থাকে, তবে দেওয়া হয় দু রকম।" বলে হোটেলওয়ালা।

"ইয়ার্কি? বার করো আর সব মাছ। টেংরা বলে খাওয়ালে তো আড়ট্যাংরা। কই মাছ, না খলসে?"

"টেংরা কইয়া যা খাওয়াইল্ল তা নির্ঘাৎ সমুদ্রের মাছ।"

একটা কৈ মাছের সাতের আট অংশ খেয়ে বাজে শিবপুরের গোপাল বলে—"কৈ মাছ পচা—আমি খেলুম না। আমাকে অন্য মাছ দাও।"

আধ ঘণ্টা ধরে লড়াই চললো। তারপর দাম দেবার পালা।

"বড়োদের এক টাকা করে, বাচ্চাদের আট আনা।" বলে আবলুশ।

"অবিচার করো না, বাবু। পাঁচ সিকি তো নিজেরাই বললে।"

"ব্যাটা, পাঁচ রকম মাছ খাইয়েছিস যে পাঁস্‌সিকে দেবো?"

"বাচ্চা কটা ধরছো?"

"পাঁচটা।"

"সাতজন তো।"

"দুটো কিছু খায়নি।"

পনের মিনিট বাদানুবাদের পরে আর সহ্য হলো না। বললাম:

দিয়ে দিন না, মশাই। আর যায় কোথা! "আপনার জন্যেই তো, মশাই, এ হোটেলে এলাম। এতো দরদ কেন? বুঝেছি, বড়ো বড়ো মাছ তো আপনার পাতেই পড়েছিলো।"

ঐ এক টাকা করেই দাম দিল ওরা। কিন্তু, হোটেলওলা অতো সহজ পাত্তর নয়। নরমে গরমে আরো আধ ঘণ্টা বাদানুবাদের পর সেই পাঁচসিকে করেই দাম আদায় করলো।

ডাব খেতে যাচ্ছি, আবলুশ বলে—"উঁহু, এখানে নয়—দাম বেশি। বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে শস্তা।"

বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে ডাবের চিহ্নও নেই। "আহা হা! সব বিক্রী হয়ে গেছে। চলুন, ভুবনেশ্বরে গিয়েই খাবেন।" ওরা আগে থাকতেই অনেকগুলো ডাব কিনে রেখেছিল। বাসে উঠেই খেতে সুরু করলো। আমার কাজ তখন শুধু তাকিয়ে দেখা।

ভুবনেশ্বর মন্দিরে পাণ্ডাদের প্রশ্নের জবাবে ওরা আমাকে দেখিয়ে বললে—এই আমাদের পাণ্ডা। সায়েব আবার কেরেস্তান গো। বলেই সব সরে পড়ল। এক ছোকরা পাণ্ডা আমায় ইংরেজীতে লেখা নোটিশটা দেখালো: অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। তখন হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করা যে কী ভীষণ ব্যাপার! প্রায়-ভুলে যাওয়া গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে ও একটি টাকা দক্ষিণা দিয়ে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলো।

দুধকুণ্ডে গিয়ে ওরা জল খেল এক-একজন চার-পাঁচ গেলাস। গাছ থেকে পেড়ে খেল কাঁচা আম। তারপর গাড়ি গেল নতুন সহরের ভেতর দিয়ে খণ্ডগিরি উদয়গিরি।

একা একা পাহাড়-গুহা ঘুরে যখন গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম তখন অন্য কারোর কোনো চিহ্ন নেই। সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছুই ভালো লাগছে না। আস্তে আস্তে নির্জন চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। ভিতরের আধো অন্ধকার ঘরে

কথা হচ্ছে ঃ "খুব কষ্ট হয়েছে, না গো ? খাও এই রসগোল্লাগুলো খাও।" একটু ঠাহর করে দেখি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার মাঝবয়েসী 'কুক'। উঠে এসে দাঁড়ালাম একখানা নতুন মডেলের শেভ্রলে গাড়ির সামনে। "তেরি কসম্-ম্-ম্—!" পিছন দিকে তীব্র চীৎকার—টানজিস্টর হাতে সেই ছোকরা।

"জানেন, এ-গাড়িতে কে এসেছেন ? দুজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট। কতো জ্ঞান। —ওঁদের সঙ্গেই তো দেখে এলাম কলিঙ্গ যুদ্ধের মাঠটা।"

সঙ্গের লোলিটা সদৃশ মেয়েটি।

"কলিঙ্গ-যুদ্ধ এখানে হয়েছিলো ?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ, এই তো সব বুদ্ধ-মন্দির। অশোক তো ঐ মাঠের রক্তাক্ত চেহারা দেখেই বুদ্ধ হয়ে গিয়ে এ-সব মন্দির বানান। গাইড

২৮ তারিখ—মাস শেষ হতে তিন দিন বাকি। কে একজন ওর মাইনে নিয়ে এল—১৫ দিনের মাইনে। প্রবাল জানত না যে মাস-কাবারের আগেই মাইনে হয়ে যায় সদাগরি আপিসে, তাই একটু আশ্চর্য হল।

কিন্তু, আরো আশ্চর্য হল যখন খামটা খুলে দেখে পনের দিনের মাইনে ছশো টাকার জায়গায় রয়েছে মাত্র তিনশো টাকা! "তিনশো কেন?" জিজ্ঞেস করল সেক্রেটারিকে।

"এই এখানকার দস্তুর", মৃদু হেসে বললেন সেক্রেটারি।

"কী? রিসিটস্ট্যাম্পে সই করলুম তো ছশো টাকা বলে!" বলে প্রবাল।

"ও রকমই করতে হয়।" ওর বিস্ময়ের ঘোর বাড়ালেন সেক্রেটারি—জানালেন, অফিসরদের সবাইকেই তাদের মাইনের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ ছাড়তে হয়। এইটেই নিয়ম!

লালাজীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করল প্রবাল, হল না। লালাজী বেরিয়ে গেছেন। কেমন যেন হয়ে গেল মনটা। সেক্রেটারি যা বলছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি। এ কী রকম কথা! না, আজই পিসেমশাইকে বলতে হবে। অবিশ্যি মাসে ছশো টাকাও কম নয়। ও তো লালাজীকে প্রথম দিন বলে ে লও পাঁচ-ছশো টাকা ওর দরকার মাসে। কিন্তু, তাহলেও বারো শো লিখে ছশো হাতে পাওয়া— নাঃ, এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার!

সে রাত্তিরে পিসেমশাইকে বলা হল না, পরের সকালেও নয়। আপিসে আসতেই বাহাদুরি ওকে নিয়ে আবার বেরুলেন। প্রথমে গেলেন সলিসিটর বালম এণ্ড কোং-তে। সেখানে যে আলোচনা হল তাতে জানলো ঝাপ্‌পড়দের প্রায় কুড়ি বিঘে জমি গবর্ণমেণ্টের দখলে রয়েছে—জমিটা তারাতলা রোডের কাছে এবং সেই দখল ছাড়াবার জন্যে ওরা বদ্ধপরিকর। কাজ অনেকটা এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু জনৈক আমলা বাদ সাধল। লালাজী ঐ জমি

নিয়ে ভয়ানক আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, বাহাদুরিকে অনেক কথা শুনিয়েছেন। যাহোক, আবার নতুন একটা যোগাযোগ হয়েছে এবং আজকে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখবেন বাহাদুরি। না হলে কী যে হবে!·· সলিসিটর সাহারিয়ার সঙ্গে ফিসফিস করে অনেক কথা বলে বাহাদুরি উঠলেন। ওঁকে আজ খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

আজও আবার মহাকরণে। সেখানে প্রায় সারাদিন—লাঞ্চ খেতে ভুলে গেলেন বাহাদুরি। কোনো কোনো কর্তা সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলেন, কেউ কেউ দেরি করে, কেউ দেখা করলেনই না। দিনের শেষে যখন ফিরছে ওরা তখন বাহাদুরির মুখে শ্রাবণের মেঘ, বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। আপিসে ফিরতেই সেক্রেটারি জানালেনঃ লালা রতনচাঁদ ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন। প্রবালকে নিয়ে লালাজীর ঘরে ঢুকলেন বাহাদুরি।

"আইয়ে, আইয়ে।" হাসি হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন লালা রতনচাঁদ। "সাক্‌সেসফুল, বাহাদুরি ?" জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"সরি, স্যর", বলেন বাহাদুরি।

"হোয়াট ! আন্‌সাকসেসফুল ? ইউ ফুল !" চিৎকার করে ওঠেন রতনচাঁদ।

বিড়বিড় করে কী যেন বলতে গেলেন বাহাদুরি।

"চুপ রা বেটি— ! কাম্ নেই হোনেসে তলব মিলেগা কাহাঁসে ? প্যায়সা ফোকট্‌সে আতা ?" চোখ টকটকে লাল রতনচাঁদের।

বিড়বিড় করে আবার যেন কী বলতে গেলেন বাহাদুরি।

"শাট্ আপ্, ইউ ইডিয়ট ! বাহাদুরি ! বাহাদুরকা বেটা ! ভেয়ান— !"

আবারও যেন কী বলববার চেষ্টা করলেন বাহাদুরি।

"ফিন্ বক্‌বকাতা, মাতর— ! মারেংগে এক ঝাপ্‌পড় !"

চিৎকার করে এগিয়ে গেলেন রতনচাঁদ। "নিকাল্, নিকাল্ ইহাঁসে! গেট আউট্, গেট আউট্!" বেরিয়ে গেলেন বাহাদুরি।

প্রবাল তখন দারুভূত মুরারি। শুধু মাথার ভেতরে ওর লক্ষ লক্ষ তারার ঠোকাঠুকি চলছে! সীটে বসে জল খেলেন রতনচাঁদ। সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন—"চৌধুরী, মাই বয়! ও ইডিয়টটা যা পারল না তা তোমাকেই করতে হবে। কালকে থেকে লেগে যাও। ও-জমিটা আমার চাই-ই। তুমি পারবে। কী বলো?"

প্রবালের তখন গলা ধরে এসেছে। ফিসফিস করে বলল, "আমার তো সরকারী মহলে তেমন যোগাযোগ নেই।"

"হাঃ, তোমার আবার যোগাযোগ নেই!" একটু শব্দ করে হাসলেন রতনচাঁদ। "চেষ্টা করলে ঠিকই বেরিয়ে যাবে। পিসেমশাইকে বলো—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মুরুব্বিরা তোমার সহায়। এই কাজের ওপরে তোমার ভবিষ্যৎ। অ্যাম ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট দিস ম্যাটার। মাইনে অনেক বাড়িয়ে দেব। আচ্ছা, গুড নাইট।"

প্রায় টলতে টলতে রতনচাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রবাল। মনে কিন্তু তখন তার একটি অটল সিদ্ধান্ত: কালকে থেকে ও আর ঝাপ্‌পড়দের চাকরি করবে না। না, পিসেমশাই-ও সে-সিদ্ধান্ত থেকে ওকে টলাতে পারবেন না।

কূর্ম-অবতার

যেদিন ঝাপ্‌পড়দের আপিস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলো প্রবাল, মাথা ঘুরছিলো বন বন করে, সেদিন থেকে আর ব্যক্তিগত মালিকানায় ওর কোন আগ্রহ নেই। মিক্সড ইকনমি সম্পর্কেই ভাবতে শিখেছে নতুন করে। কলকাতার কায়স্থ সন্তান হলে কী হবে, চরিত্রে ওর এমন একটা গোঁ আছে যা পদ্মাপারের মানুষেই সম্ভবে। চাকরি নেই, একগাদা পোষ্য, জীবনাধিক প্রিয়

তো তাই বললো। ঐ দেখুন, সেই আমেরিকান-কাপল্ আর গাইড।"

টাইম-ম্যাগাজিনে একবার একটা শিকাগোর কসাইয়ের ছবি দেখেছিলাম। আমেরিকার ভদ্রলোকের চেহারা হুবহু সেই রকম। সঙ্গের লোলিটা-সদৃশ মেয়েটি ওর কী হয়—কে জানে। গাইড আসলে ড্রাইভর। চলে গেল ওরা। ছোকরাও গেল চায়ের দোকানে।

আস্তে আস্তে বাসের দিকেই ফিরলাম। কাছাকাছি আসতেই ভিতর থেকে কথা ভেসে এলো: "আরে, এইখানে কী সুরু করলা?"

"ক্যান, সুন্দরি! অসুবিধা কী? গাড়ি তো ফাঁকা।"

"[illegible], যাও, কোনারক দেইখ্যা মাথা তোমাব খারাপ হইয়া গ্যাছে!"

আবার চায়ের দোকানের দিকেই গেলাম।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। বাস তখন পুরী থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো আবলুশ—"ড্রাইভার, নিউ ক্যাপিটাল দেখালে না?"

"আইজ্ঞা, দেখালাম তো—উদয়গিরি যাবার স[illegible]।"

"আবে, ও তো যেতে যেতে গোটাকতো বাড়ি দেখালে! ক্যাপিটাল কোথায়?"

"ঐ তো ক্যাপিটাল। নতুন রাজঅধানী—আর কিছু নেই।"

"চালাকি পেয়োছো! তুমি ফাঁকি দিয়োছে।। পুরো টাকা পাবে না।"

"কী বলছেন, আইজ্ঞা। পাগোলের মতো কথা বলছেন যে!"

"কী? আমি পাগোল! মুখ সামলে কথা বলবি, বাঞ্চোৎ!"

"তুমিও, সড়া, মুখ সামলে কথা বলবে।" হাফ প্যাণ্ট-পরা সাড়ে তিনফুট ড্রাইভারের এখন অন্য রূপ।

আবলুশ একটু হকচকিয়ে গেল। পরমূহূর্তেই চিৎকার—"কী বললি ? সালা। বাঞ্চোৎ। চল্ সালা হোটেলে। ফাঁকি দিয়ে টাকা নেওয়া বার করছি।"

হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে গেল বাসখানা। একটা বাজার মতো জায়গা। ড্রাইভার আর ক্লীনার নেমে গেল। একটু বাদেই দেখি একদল লোক উত্তেজিতভাবে এসে বাস ঘিরে ফেললো। তাদের মধ্যে মাতব্বর ধরণের একজন চিৎকার করে বললো: "টঙ্কা দে ড্রাইভারকে!" ওরা আরো অনেক মধুর মধুর কথা শোনালো। আবলুশ কাঠ হয়ে গিয়েছে তখন। ওর দাদা পকেট থেকে টাকা বার করতেই এগিয়ে এলো ড্রাইভার। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলো, তারপর বললো—"নেমে যাও সবাই। এ-গাড়ি আর যাবে না।" "কী করে ফিরবো আমবা?" কে একজন জিজ্ঞেস করলো। "তা কে জানে!" জবাব দিল ড্রাইভার। তারপর একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো।

মিনিট পনের বাদে নেমে এলাম বাস থেকে। লোকগুলো তখনও জটলা করছে। ড্রাইভারকে গিয়ে বললাম—"এতোগুলো বাচ্চা, মহিলা—এঁরা কী করে শহরে ফিরবেন। দয়া করে পৌঁছে দিলে হতো না।" ভ্যাক্ করে উঠলো ড্রাইভার। কথা বাড়ালাম না, সোজা হাঁটতে সুরু করলাম পুরীর দিকে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একা একা অপরিচিত নির্জন রাস্তায় কোনো রকমে পা দুখানা টেনে টেনে চলতে লাগলাম। সহরে ঢোকার মুখে দেখি এক মস্ত সভা, বিষয়—জাতীয় সংহতি। এ-সব বিষয়ে আমার দারুণ উৎসাহ। কিন্তু, কেন জানিনা, এখন আর তেমন উৎসাহ বোধ করলাম না।

সেই রাত্তিরেই হোটেল ছেড়ে চলে এলাম। পরদিন পুরী ছেড়ে।

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য

ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেল না প্রবাল—প্রবাল চৌধুরী। তবে, সত্যিকারের হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল রিসার্চ করবে, বিলেত, আমেরিকা যাবে, এবং অবশেষে অধ্যাপনা—ইউনিভার্সিটির চেয়ার। সে-সব পরিকল্পনা আপাতত শিকেয় তুলতে হল। চাকরি চাই একটা—এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।

সব কিছুর মূলে অবিশ্যি বাবার আকস্মিক মৃত্যু।

সরকারি চাকরি ওর দুচক্ষের বিষ। তাছাড়া, আই. এ. এস্. সময়সাপেক্ষ। ছোটো কলেজে অধ্যাপনা—তাই-বা কলকাতায় চট করে মিলছে কই! পয়সাটাও দরকার, কারণ পরিবার ছোটো নয়। ও রিসার্চ করতে চেয়েছিল দেশের মিশ্র অর্থনীতি নিয়ে। রিসার্চের আশা ও ছাড়েনি এখনও। কাজেই, এমন একটা চাকরি যদি হতো যাতে শিল্প-বাণিজ্যের দুই সেকটর—পাবলিক ও প্রাইভেট বেশ ভালো করে দেখা ও জানা যায়।

পাবলিক সেকটর আণ্ডারটেকিং-এ কাজ পাওয়া পুরো সরকারী আপিসের মতোই—নির্দিষ্ট সময়ে ফর্ম দাখিল, পরীক্ষা, ইণ্টারভিয়ু, ইত্যাদি, ইত্যাদি···। সেখানে আবার আরেক ঝামেলাঃ চাকরি হলে তারা দেশের যে কোনো জায়গায় পোস্ট করবে। প্রবালের চলবে না তাতে। ওর পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়, পোষ্য অনেক, এবং রিসার্চ করতে গেলে কলকাতাই প্রশস্ত।

প্রবাল কলকাতার কায়স্থ সন্তান, পরিবার বনেদী। কোনো সদাগরী আপিসে মোটামুটি একটা চাকরি যোগাড় করা ওর তেমন অসুবিধে নয় আজও। কিন্তু যেমন তেমন কাজ হলে চলবে না ওর—দেশের শিল্প বাণিজ্য-অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এমন কোনো কাজ হলে, তবে।

সলিসিটর পিসেমশাই সব শুনলেন। ছেলেটাকে ভালোবাসেন উনি। শুধু ছাত্র ভালোই নয়, চেহারা, ব্যবহার, সবই ভালো প্রবালের। পিসেমশাই বললেনঃ দাঁড়া, আমি দেখছি। আমার মনে হয়, তোর পক্ষে ভালো হয় যদি বিল্লী ব্রাদার্স, সিংহ-হায়েনা অর্গানাইজেশন, সাধু জৈন, চিঁড়েতান কোম্পানি···এ-রকম একটা কোথায়ও ওদের শেয়ার, ইনভেস্ট্‌মেণ্ট, ফিনান্স, মার্কেট রিসার্চ জাতীয় কোনো ডিপার্টমেণ্টে অফিসর হয়ে ঢুকতে পারিস।

“ঠিক তাই,” বলে প্রবাল। “তবে, এতোগুলো নামের মধ্যে বাটলিন-হার্ন-এর নাম তো করলেন না?”

"ওরে বাপ্ ! ওখানে হবে না। অনেকের ধারণা, ওরা বুঝি বাঙালী কোম্পানি—বাংলা দেশ, বাঙালী ছেলেদের প্রেফারেন্স দেবে। হুঁ ! সে-গুড়ে বালি !" বলেন পিসেমশাই।

"যাক্‌গে, আমার দরকার চাকরি। বাঙালী-অবাঙালী দিয়ে কী হবে। আর, যেসব ফার্মের নাম করলেন ওদের সকলেরই হেড অফিস আর বেশীর ভাগ ব্যবসা তো এখানেই। ব্যবসা ছড়ানোও সব নানান শিল্প-বাণিজ্যে।"

"দেখি, বিল্লী ব্রাদার্সে তোর একটা কিছু করতে পারি কিনা। আজই যাচ্ছি আবাল্যদার কাছে।" চলে গেলেন পিসেমশাই।

পিসেমশাই ইদানীং রাজনীতিতে ঝুঁকেছেন। কর্পোরেশনের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে এখন অ্যাসেম্বলীর দিকে ধাওয়া করেছেন। আবাল্যদা সবকিছুর নাটের গুরু।

তিনদিন বাদে পিসেমশাই আবার এলেন, বললেন: "শোন, কাল বেলা এগারোটায় বিল্লী ব্রাদার্সের অফিসে যাবি। গিয়ে দেখা করবি মিঃ নান্‌জাবিয়ার সঙ্গে। নান্‌জাবিয়া ওদের অ্যাসিস্-ট্যান্ট ফিনান্‌সিয়াল অ্যাডভাইজর। যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। ও কথা বলবে তোর সঙ্গে।"

"ইন্টারভিয়্যু নাকি ?" জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

"না, ঠিক ইন্টারভিয়্যু নয়। ওর ওপরে প্রিলিমিনারি সিলেক-শনের ভার। ওর পছন্দ হলে ফর্মাল ইন্টারভিয়্যু নেবে ওদের ডিরেকটর রণছোড়দাস বিল্লী, ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজর ডক্টর খাণ্ডেলওয়াল, আর সেক্রেটারি টু দ্য বোর্ড সুরেশ গজ্জার। এ-অ্যাপয়েন্টমেন্ট খুব উঁচু স্তরের জানবি।"

"কিন্তু যে-স্তরেরই হোক, আবাল্যদার খাতিরে যখন চাকরি তখন এতো সব কেন আবার ?" হেসে প্রশ্ন করে প্রবাল।

"ওরে, আবাল্যদার আসন ওদের হৃদয়ে এখনও পাকা হয়নি। অন্তঃপুরে লোক ঢোকাচ্ছে, খুব বাজিয়ে নেবে না ?"

পরদিন বেলা পৌনে এগারোটায় বিল্লী ব্রাদার্সের আপিসে গিয়ে পৌঁছল শ্রীপ্রবাল চৌধুরী (২২), এম্. এ. (ইকন) (ক্যাল)। বিরাট আপিস, আগে কখনও আসেনি প্রবাল। প্রবালেরা এমন পরিবারের, যাদের ছেলেরা ভর্তি হতে এসে প্রথম দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজ, আর গোড়ার দিকে ভবানীপুরের ট্রামের অপেক্ষায় কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রবাল অবিশ্যি পড়াশুনো করতে ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, ইত্যাদিতে বসেছে এবং শিল্পবাণিজ্যের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান দেখে গেছে। বিল্লী ব্রাদার্সের আপিস ও বাইবে থেকে আগে দেখলেও, ভেতরে ঢুকল এই প্রথম।

প্রকাণ্ড আপিস। হবে না কেন, বিল্লীরা কি কম শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার মালিক ? হেন শিল্প নেই যাতে ওদেব কোনো না কোনো ইণ্টরেস্ট না আছে। চা, পাট, ভূষিমাল থেকে শুরু করে কলকব্জা, মোটর গাড়ি, সবকিছুর কারবার বিল্লী ব্রাদার্সের। ওদের কন্‌ট্রোলে কম্পানির সংখ্যা শ' তিনেক। সব কম্পানির হেড অফিস কলকাতায়—ঐ বাড়িতেই। মালিকেরা ওখানেই বসে।

আপিস-বাড়ির তিনটে গেটের কোনোটাতেই ও নান্‌জারিয়ার নাম দেখতে পেল না। দারোয়ান-লিফ্‌টম্যানরাও হদিস দিতে পারল না। একটা লিফ্‌টম্যান ওকে জানাল—সারা দুনিয়ার লোক আসে বিল্লী ব্রাদার্সে, নন্‌জরিয়া, মন্‌জরিয়া কে জানে। "কোনো এনকোয়ারি অফিস নেই এখানে ?" জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

"কা মালুম !" সাফ জবাব লিফ্‌টম্যানের।

এই না হলে দিশি আপিস ! মনে মনে হাসল প্রবাল।

"আচ্ছা, সেক্রেটারি সাহাব কোথায় বসেন ? বোর্ড রুম কোথায় ?" জিজ্ঞেস কবে ও।
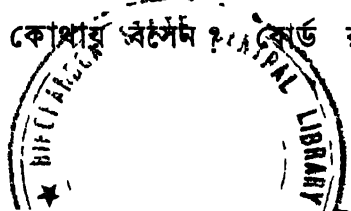
"ইহাঁ দো সও সেক্রেটারি, পাঁন্‌-ছেঠো বোর্ড রুম।" জবাব আসে তুরন্ত।

অগত্যা সিঁড়ি ভেঙ্গে প্রবাল তিনতলা অবধি উঠল। দপ্তরের ভেতরে ঢুকে দেখে অসংখ্য লোক কাজ করছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল বাংলাতে মিঃ নান্‌জারিয়ার কথা। "আই ডোণ্ট নো", জবাব এল ইংরেজীতে। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল— এবারও বাংলায়, কারণ সকলকে ওর বাঙালীই মনে হচ্ছে। সে এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যাতে মনে হল সে বোধহয় গ্রীক ভাষা শুনেছে। তাকে আবার জিজ্ঞেস করল ইংরেজীতে। জবাব এল হিন্দীতে: দেখিয়ে উধর।

ঙধর বলতে যা দেখাল সেটা ঐ তলারই সর্বশেষ প্রান্ত। সেখানে এসে জিজ্ঞেস করায় একজন বলল: দেখিয়ে তিনতল্লা (চারতলা) পর।

চারতলায় গিয়ে জানা গেল মিঃ নান্‌জারিয়া ঐ বিলডিংয়েই বসেন না, বসেন পাশের বাড়িতে। নেমে এল ওপর থেকে। পাশের বাড়ি যেতে যেতে প্রবাল ভাবতে লাগল: বিল্লী ব্রাদার্স কলকাতায় ব্যবসা করছে দীর্ঘকাল। স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারীর সংখ্যা স্থানীয় লোকই বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু দেখে মনে হল বঙ্গসন্তান বোধহয় নেই-ই ও আপিসে। 'সন্‌স্ অব দ্য সয়েল' কথাটা ও ঘেন্না করে এসেছে। এখন কিন্তু কথাটা তত খারাপ লাগল না।

অবশেষে নান্‌জারিয়ার দপ্তরে পৌঁছুল প্রবাল। স্লিপ পাঠিয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরে ও একবার তাগিদ দিল বেয়ারাকে। বেয়ারা ভেতর থেকে এসে বলল, সময় হলেই ডাক হবে।

লাঞ্চ আওয়ারে সবাই যখন স্টেনলেস স্টীলের গেলাসে করে দুধ খাচ্ছে—দুধ এবং গেলাস দুইই কোম্পানির: বিল্লী ব্রাদার্সের বৈশিষ্ট্য এটা, বললে এক বেয়ারা—তখন ডাক পড়ল প্রবালের।

মুখে গভীর বসন্তের ক্ষত মিঃ নান্‌জারিয়ার—ঘোর কালো রং, সবুজ টেরিলিনের বুশ সার্ট গায়ে। "সিট্‌ ডাউন", বললেন নানজারিয়া। "তোমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্‌স্‌ ডিগ্রীর ওপর আমার খুব আস্থা নেই," এই বলে কথা শুরু করলেন নান্‌জারিয়া। জননী, জন্মভূমি এবং আলমা মাতের—তিনটেই এক পর্যায়ের প্রবালের কাছে। কাজেই ওর জবাবটা মোটেই চাকরির উমেদারের
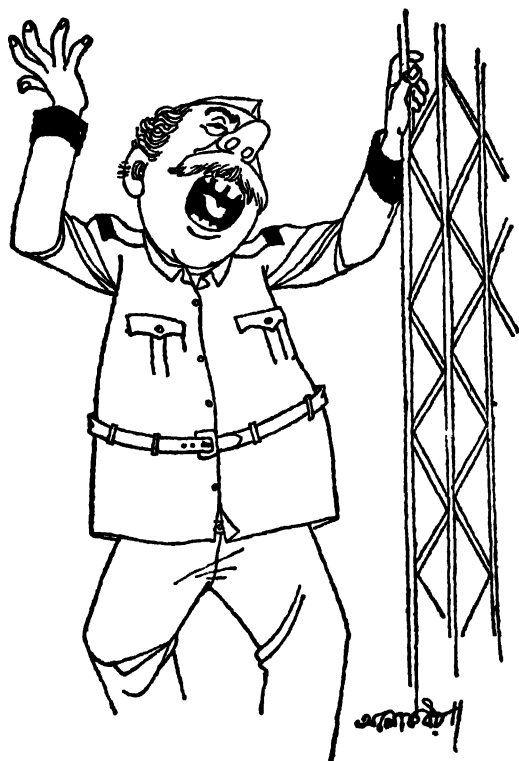
—কা মালুম!

মতো হল না। ওর প্রশ্নের জবাবে নান্‌জারিয়া বললেন, তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ভারতবর্ষের আর্থনীতিক জীবন নিয়ে গোটাকতো প্রশ্ন করলেন নান্‌জারিয়া। প্রবাল পরিষ্কার বলল, সে মিশ্র অর্থনীতির একজন উৎসাহী সমর্থক। দেশের মূল শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণে বিশ্বাসী সে।

তবে, প্রাইভেট সেকটরের বিনাশ সে চায় না। প্রাইভেট সেকটর পাবলিকের সঙ্গে হেলদি কম্‌পিটিশনে নামুক—ওর বক্তব্য এই। বিল্লী ব্রাদার্স সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রবাল সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। তারপর নান্‌জারিয়া ওকে প্রশ্ন করলেন ঐ সন্‌স্ অব দ্য সয়েল কথাটি নিয়ে। প্রবাল পরিষ্কার বলল, কথাটা ওর এতোদিন অসহ্য ঠেকত; তবে স্থানীয় লোকদের অবস্থা দেখে, এবং কিছু কিছু বড়ো আপিসের চেহারা দেখে, ওর ধারণা হয়েছে কথাটাকে যতোটা সংকীর্ণতার দ্যোতক মনে করা হয় ঠিক ততটা হয়তো নয়।

"আচ্ছা", হঠাৎ বললেন নান্‌জারিয়া, "আপনি আস্থন তাহলে।" কথাটার আকস্মিকতায় ব্যথিত হল প্রবাল; তবু, নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যেবেলায় পিশেমশাই এলেন। প্রবালের ধারণা ওর ইণ্টারভিয়্যু ভালো হয়েছে। পিসেমশাই কিন্তু তা স্বীকার করলেন না।

দুদিন বাদে জানা গেল বিল্লী ব্রাদার্সে ওর চাকরি হবে না। আবাল্যদাকে ওরা বলেছে একটি কম্যুনিস্ট ছেলেকে চাকরি দিতে অক্ষম ওরা। আবাল্যদা পিসেমশাইকে ধমকেছেন। পিসেমশাই সলিসিটর মানুষ—ধমকানিতে ভয় পান না। তিনি বরং পরিষ্কার বলেছেন আবাল্যদাকে—"আসলে ওরা আপনাকে তাচ্ছিল্য করছে। বিল্লীদের হাতে দিল্লী বাঁধা কিনা, তাই। প্রবালের মতো ছেলে হয় না। জব্দ করুন ওদের—।" কথাটা আবাল্যদার মনে ধরেছে এবং কোন অস্ত্রে বিল্লী হারামজাদাদের জব্দ করা যায় তা মনে মনে ঠিক করেছেন উনি।

কিন্তু, প্রবালের চাকরির কি হবে? "কুছ পরোয়া নেই," বলেছেন আবাল্যদা। "ঝাপ্‌পড়দের ওখানে করে দিচ্ছি। ওসব ফাজলামি—ইণ্টারভিয়্যু, রিগ্রেট করা—ওসবের বালাই থাকবে না। ঝাপ্‌পড় খারাপ কী?"

"না, খারাপ কী? আর ওরা তো আপনার একেবারে আপনার জন, বিশেষ করে বিনু রথচালক যখন কেওঞ্ঝড়ে ঝাপ্‌পড়দের কাগজের কলটা করতে দিতে রাজী হয়েছে। বিনু তো স্রেফ আপনার কথাতেই—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি তো জানোই সব।" পিসেমশাইকে চট্‌ করে থামিয়ে দেন আবাল্যদা। "তোমার প্রবালের ব্যবস্থা আমি কালই করছি। ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। ও যেন কোথাও মুখ না খোলে।"

"আচ্ছা।" বললেন পিসেমশাই।

আবাল্যদা মোটামুটি সব জিনিসই বোঝেন, তবে ইকনমিক্‌স জিনিসটা ঠিক মাথায় ঢোকে না ওঁর। হঠাৎ মনে হল, প্রবাল ছোকরা তো এ-ব্যাপারে ওঁকে সময়ে-অসময়ে সাহায্য করতে পারে। ওঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে দুঁদে সলিসিটর আছে, ডাকসাইটে উকীল আছে, ইংরেজী-নবীস অধ্যাপক আছে, সব রকমের দালাল আছে; নেই শুধু অর্থনীতিবিদ্‌।

পরদিনই প্রবাল দেখা করল আবাল্যদার সঙ্গে। খুশী হলেন আবাল্যদা—ওকে দিয়ে কাজ হবে ওঁর।

পরের সপ্তাহে পিসেমশাই এলেন। বললেন—"কাল সকালে যাবি ঝাপ্‌পড় ব্রাদার্সে। গিয়ে দেখা করবি রতনচাঁদ ঝাপ্‌পড়ের সঙ্গে। রতনচাঁদই মালিক। ঝাপ্‌পড়রা বিল্লী ব্রাদার্সের মতো অতো বড়ো না হলেও নেহাত ছোটো নয়—প্রায় প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী। সম্প্রতি ব্যবসার প্রসার ঘটেছে, বিরাট নতুন আপিস-বাড়ি করেছে। ওদের আরেকটি ভালো জিনিস: কর্মচারীর মধ্যে বেশীর ভাগই সন্‌স্‌ অব দ্য সয়েল।"

আপিস দেখে ভালোই লাগল প্রবালের। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন,

নতুন বাড়ি। রতনচাঁদের ঘর চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। স্লিপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল।

হেসে বসতে বললেন রতনচাঁদ। চেহারা অত্যন্ত রুক্ষ, কিন্তু মানুষটা মনে হল বেশ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা, উর্দুমিশ্রিত হিন্দী আর পঞ্চনদীয় ইংরেজীতে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আবাল্যদার সঙ্গে কেমন যোগাযোগ, কী ধরনের কাজ ওর পছন্দ, এবং কেমন মাইনে হলে ওর চলে—এসব খুব স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করলেন। প্রবালের জবাবে খুশীই হলেন মনে হল। কফি খাওয়ালেন ওকে। তারপর ডাকলেন সেক্রেটারিকে। তাঁকে বললেন প্রবালকে কোনো একটা ঘরে বসিয়ে দিতে এবং কিছুদিন ট্রেনিং দিতে। কাজকর্ম দেখুক, তারপর একটা যথাযোগ্য কাজ দেওয়া হবে তাকে। ট্রেনিং পিয়েরিয়েডে একটা অ্যালাউয়েন্স দেওয়া হবে—কতো, সেটা ঠিক করে দেবেন উনিই—প্রবালের চিন্তার কোনো কারণ নেই। পরে গ্রেড-স্কেল সব ঠিক করা যাবে।

সেক্রেটারি ভদ্রলোক, কী আশ্চর্য, মাদ্রাজী নন। তিনি ওকে নিয়ে গেলেন ওঁর নিজের ঘরে। প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর একটা ফাইল দিয়ে বললেন, পড়ুন এটা।

ফাইলটা পড়তে লাগল প্রবাল। ঝাপ্‌পড়েরা কতোগুলো কম্পানি ম্যানেজ করে, কোন কম্পানির কী ব্যবসা, কোথায় মিল-ফ্যাক্টরি-কোলিয়ারি, এ-সব বিবরণ আছে ঐ ফাইলে। অনেকক্ষণ ধরে ফাইলটা পড়ল প্রবাল। বেশ ইণ্টরেস্টিং লাগছে ওর। কিছুক্ষণ বাদে সেক্রেটারি ভদ্রলোক আরেকটা ফাইল দেখতে বললেন ওকে। সেটাতে গত বছরে কম্পানি কেমন কাজ করেছে, কতো লাভ-ক্ষতি করেছে, কী ডিভিডেণ্ড দিয়েছে—সব লেখা আছে। একটা জিনিস ওর ভালো লাগল না। দেখল, ঝাপ্‌পড়দের বেশীর ভাগ কম্পানিতেই ক্ষতি হয়েছে, লাভের কম্পানিতেও ডিভিডেণ্ডের মাত্রা সামান্য।

এসব দেখতে দেখতেই দিন কেটে গেল। সেক্রেটারি বললেন, ওর কাজ আজ থেকেই সুরু। প্রবাল বলল: "অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার?" "ও আমরা সাধারণত কাউকে দিই না।" বললেন সেক্রেটারি।

পিসেমশাই সন্ধ্যেবেলায় সব শুনে ভারি খুশী। বললেন, "দেখ, আবাল্যদার ক্ষমতা দেখ। খোদ মালিক তোকে পেয়ার করবে—সোজা কথা! মাইনেটা বেশী না বলে এখন ভালোই করেছিস। ও পরে বাড়িয়ে দেয়া যাবে। হ্যাঁ, তুই আবাল্যদার সঙ্গে দেখা করে এসেছিস তো?"

"না।"

"না, কেন রে! ওখানে রোজ সন্ধ্যেবেলায় যাবি একবারটি।" বেশ জোর দিয়ে বলেন পিসেমশাই।

"রোজ গেলে কী করে চলবে! আমার লেখাপড়া?" বলে প্রবাল।

"আরে, লেখাপড়া কি পালিয়ে যাচ্ছে? লেখাপড়া মানে তোর ডক্টরেট তো? তা, সে ভার তুই আবাল্যদার ওপরেই ছেড়ে দে।" হেসে বলেন পিসেমশাই।

"না, পিসেমশাই, কেউ আমাকে ডক্টরেট পাইয়ে দিক, এ আমি চাইনে। ওটা আমি খেটেখুটে পেতে চাই। আর, ওটা একবার পেয়ে গেলে আমার ইউনিভার্সিটির চাকরির অভাব হবে না। ইকনমিক্স্ ডক্টরেটের এখনও দাম আছে।" বেশ গম্ভীর হয়ে বলে প্রবাল।

"ওরে, পাগলা, মাস্টারি করলে চলবে! দেখ না এই ঝাপ্‌পড়দের ওখানেই দু'হাজার টাকা মাইনে হয়ে যাবে তোর কিছুদিন বাদে। ডক্টরেট হলে আরো বেশী। আর সে ডক্টরেট গুরুকুল, না আন্নামালাই, না শিলিগুড়ির—তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না! আবাল্যদার সঙ্গ ছাড়বিনে।. বহুদিন বাদে বাংলাদেশে

একটা হুঁদে লোক জন্মেছে, মনে রাখিস। আরেকটা কথা। আমরা, বাঙ্গালীরা, নিজে নিজে বিশেষ কিছু করতে পারি নে। মাথার ওপর শক্ত প্রভু থাকলে তার চরণচ্ছায়ায় বসে আমরা সব কিছু পারি। দেখলি নে, ইংরেজ আমলে কী করলাম আমরা। এখন নতুন প্রভু জোটাতে হবে। জুটেও যাচ্ছে। উত্তর ভারতীয় রাজপুরুষ আর পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ী। যাক, কালকে আবাল্যদার সঙ্গে দেখা করে আসবি, বুঝলি?" চলে গেলেন পিসেমশাই।

পিসেমশাইয়ের কথাগুলো সব ঠোকাঠুকি করতে লাগল প্রবালের মাথার মধ্যে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হল না।

পরদিন আপিসে যেতেই রতনচাঁদ ঝাপ্‌পড়ের তলব। হেসে অভ্যর্থনা করলেন রতনচাঁদ। সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা, উর্দু মিশ্রিত হিন্দী আর পঞ্চনদীয় ইংরেজীতে অনেক কথা বললেন। একমাস প্রবালকে ট্রেনিং নিতে বললেন বিভিন্ন কাজের—প্রথমে অ্যাকাউন্টস্, তারপরে ল, এবং সর্বশেষে অ্যাডমিন্‌স্ট্রেশন। মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা করতেও বললেন। সর্বশেষে বললেন: মাসে বারো শো টাকা করে তোমার কনসলিডেটেড মাইনে।

খুশীতে উচ্ছল প্রবাল চৌধুরী বেরিয়ে এল রতনচাঁদ ঝাপ্‌পড়ের ঘর থেকে। সেক্রেটারির কাছে যেতেই তিনি বললেন—"চলুন, অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে দিয়ে আসি আপনাকে।"

"চলুন।"

অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট তামিল। তিনি প্রথমেই বললেন, লে মেনদের পক্ষে অ্যাকাউন্টস্ বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার। ডেবিট-ক্রেডিট্ ভয়াবহ জিনিস।

প্রবাল বলল ডেবিট ক্রেডিট সে মোটামুটি বোঝে।

"তাহলে আর ট্রেনিং-এর দরকার কী এর?" সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করেন অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট।

সেক্রেটারী বলেন, কর্তার হুকুম।

প্রবাল হেসেই বলল—ডেবিট-ক্রেডিটের ওপরে যেসব বস্তু আছে ও তাই জানতে চায়।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট বললেন সেক্রেটারিকে, তিনি এখন ক্লোজিং নিয়ে ব্যস্ত, ইস্কুল করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

সেক্রেটারি বললেন, "ঠিক আছে। অ্যাকাউন্টসের তালিম পরে নিলেই চলবে। আগে ল' টাই হোক। চলুন ল অফিসরের কাছে যাই।"

ল' ডিপার্টমেণ্টে যেতে যেতে প্রবাল জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, আমি তো চেয়েছিলাম আপনাদের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের কাজ। কেমন করে, কোথা থেকে, আপনাদের ফিনান্স যোগাড় হয়, কী করে কম্পানি ফ্লোট করা হয়, কোথায় কোথায়, কার কার সঙ্গে কোলাবরেশন হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন লাইনে চলে, তা থেকে কেমন লাভ হয়…ইত্যাদি কাজ। তা অ্যাকাউন্টস্, ল', অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দিয়ে কী হবে আমার।"

"একবারেই কি ফিনান্সে যাওয়া যায়?" বলেন সেক্রেটারি। "তাছাড়া, লালাজীর হুকুম, এসব জায়গা আপনাকে ঘুরতে হবে। অবিশ্যি যে কাজ আপনাকে করতে হবে তার সঙ্গে এসবের কোনো যোগাযোগ নেই, তবু।"

"কী কাজ করতে হবে আমাকে, বলুন না?" ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে প্রবাল।

"লালাজীই বলবেন। আমি শুধু তাঁর কথামতো আপনাকে নানান জায়গায় ঘোরাচ্ছি।" একটু হাসলেন ভদ্রলোক।

লালাজীই বললেন ওকে দিন দশেক পরে। বললেন, অফিসের সাধারণ কাজ করবার অনেক লোক আছে। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলের ওতে শেখবার কিছু নেই। তুমি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতটাকে চেন, জান।

আজকাল ব্যবসা করার কতো ঝামেলা—সরকারী, আধা-সরকারী সব অফিসের কতো কায়দা-কানুন। এ-সব দেখো, শোন—আলাপ করো, যোগাযোগ করো· ····।

মন্দ কী? মনে মনে ভাবল প্রবাল। থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগতটাকে।—মনে মনে একটু হাসল ও।

পরদিন ওকে ডাকলেন ওদের মুভমেণ্ট অফিসর—মিঃ বাহাদুরি। মুভমেণ্ট অফিসরের কাজ কী তা ভেবে ও কুল পায়নি কখনও, তবে আপিসে দেখেছে ভদ্রলোকের ভীষণ প্রতিপত্তি। সেক্রেটারি বা অন্য কোনো বড় অফিসারকে পাত্তা দেন না, মালিকের ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত। মিঃ বাহাদুরি কিন্তু গৌড়-সন্তান—ভাদুড়ী।

মস্ত বড়ো চেম্বার অতি সুন্দর সাজানো মিঃ বাহাদুরির। লম্বা-চওড়া, বড়ো গোঁফ, রাশভারী লোক।

"আপনাকে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে", বললেন বাহাদুরি।

"এক্ষুনি। আমি তৈরী," বলল প্রবাল।

মস্ত বড়ো একখানা নতুন মডেলের শেভ্রলে গাড়িতে বাহাদুরি আর প্রবাল। জমকালো উর্দিপরা শিখ ড্রাইভর। গাড়িতে বসে ভদ্রলোক অল্প কথায় প্রবালের বংশ-পরিচয়, আত্মীয়-স্বজন, সব জেনে নিলেন।

ওরা প্রথমে গেল এক ব্যাংকে। এজেন্টের ঘরে বসে কফি খেতে খেতে প্রবাল ওদের কথা সব শুনল। সবটা না বুঝলেও এটা বুঝল যে ঝাপ্‌পড়দের নতুন কম্পানিটার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে আসবে কোনো একটা ক্রেডিট ইনস্‌টিট্যুশনের লোক—ব্যাংক যেন 'ঠিকমতো' সব খবর দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে ওরা গেল রিজার্ভ ব্যাংকে—ভেতরে বাহাদুরি একাই গেলেন—প্রবাল রইল গাড়িতে বসে। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন ফিরলেন বাহাদুরি ওঁর কপালে তখন অনেক ঘাম। তারপর রাইটার্স বিল্‌ডিংস্‌। সেখানে এক বড়ো কর্তার ঘরে কার্ড দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক

পড়ল। সেখানে অনেক কথাবার্তায় প্রবাল এটুকু বুঝল যে, ঝাপ্‌পড়দের একটা নতুন কম্পানি খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন না বোধ হয়। সেদিন এই পর্যন্ত। ফেরবার পথে বাহাদুরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুণ্ডপাত করতে করতে এলেন। ঝাপ্‌পড়রা যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যত্র

নিকাল্, নিকাল, ইঁহাসে…!

নিয়ে যাবার কথা ভাবছে, এবং এর মধ্যেই যে কটা ফ্যাক্টরি ফরিদাবাদে স্থানান্তরিত করেছে, সে কথাও বললেন।

আপিসে ফিরে নিজের কামরায় গেল প্রবাল। সেদিন মাসের

স্পার্চ করা বন্ধ আছে, তবু পিসেমশাইয়ের মিষ্টিকথা, চোখ-রাঙানি, অনুনয়-বিনয়, আদেশ-উপদেশ, কিছুতেই ও টলে নি আর। না, আর কোনো বেসরকারী আপিসে ও কাজ করবে না। একটা ভালো ট্যুশনি তো আগে থাকতেই করছিলো, আরো গোটা দুয়েক মাঝারি ধরণের ট্যুশনি নিলো ও। কম্প্যানির কাগজ নেই নেই করেও ক'খানা ছিলো শেষ পর্যন্ত—পুরোনো কম সুদের কাগজ, বাজার দর নিতান্ত কম। তবু প্রয়োজনে তারই দু'চারখানা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। মায়ের হাতে গয়নাও ক'খানা আছে, কলকেতিয়া ঐতিহ্যের জন্যে সেগুলোতে এখনও টান পড়েনি। তবে, একালের ছেলে প্রবাল; প্রয়োজন হলে সেদিকেও হাত বাড়ানো যাবে। রিসার্চ আপাতত বন্ধ থাক, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। এখনও দুবছর সময় হাতে আছে। দেখা যাক, এর মধ্যে কী করা যায়। যে-কোনো একটা পরীক্ষায় পাশ ও করবেই। মুশকিল হলো পোস্টিং নিয়ে। তখন যদি পিসেমশাই একটু চেষ্টা করেন।

পিসেমশাই বাজে সেন্টিমেন্টের ধার ধারেন না। তবু, প্রবীণ লোক, অসহযোগের আমল থেকে স্বদেশী দলের সঙ্গে যোগ। বর্তমান বাংলা দেশের অবস্থা ওঁদের কল্পনারও বাইরে ছিলো। মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতাও করেছেন: ক্ষুদিরামের বাংলা, প্রফুল্ল চাকীর বাংলা, অনুশীলন-যুগান্তরের বাংলা, অসহযোগ আন্দোলনের বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, দেশপ্রিয়ের বাংলা, নেতাজীর বাংলা, শত শত জানা-অজানা আদর্শবান দেশভক্তের বাংলার আজ এ কী চেহারা! টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হয়?…শত্রুপক্ষ বলে, গেলো কর্পোরেশন ইলেকশনে টাকাটা নাকি ওঁকে বেশি মাত্রায় খরচ করতে হয়। ভদ্রলোক সেটাও ভুলতে পারছেন না, আবার আগামী অ্যাসেম্বলী ইলেকসনে যাতে একটু কম-সমে হয় তার জন্যে আগে থেকেই পাড়ার সভা-সমিতিতে ঐ ধরণের গাওনা গেয়ে

রাখছেন।…সে যাই হোক, মুখে অপ্রসন্ন হলেও মনে মনে প্রবালের আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় উনি একটু খুশিই হয়েছেন। ঝাপ্‌পড়ুরা আর কতোকাল ঝাপ্‌পড় মারবে আমাদের—এ রকম কথাও না কি ওঁর প্রধানতম সহকারীকে একবার বলেছেন। প্রবালের মতো ভালো ছেলে—বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা ও চরিত্রে যে তুলনাহীন-তার একটা ভালো চাকরি হয় না এই কলকাতা শহরে! এ কলকাতা শহরটা কাদের? ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বাল্যাবস্থায় যারা হুগলী থেকে এসে কলকাতা সমাজের মাথা হয়ে বসে, ফোর্ট উইলিয়মের কাছে ছিলো যাদের আদি বসতি, ভবানীপুর গ্রামের তিন প্রধানের এক প্রধান ছিলো যাদের পিতৃপুরুষেরা, ইয়োরোপীয় শিক্ষায় যারা এদেশে অন্যতম পাইওনিয়ার, তাদের অধস্তন পুরুষ আজ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হয় সুদূর হরিয়ানা প্রান্তের এক ঝাঁকামুটের গদিতে, আর সেখানে অপমানিত হয়ে চলে আসতে হয়। সাতচল্লিশ সালে বাংলা পার্টিশানের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি। এখন তিনি—কলকাতার বনেদী সলিসিটর, অক্সব্রিজ মিটারের সিনিয়র পার্টনার, খতাই মিত্তির—মনে করেন ওর চেয়ে বড়ো দুষ্কর্ম তিনি জীবনে করেন নি। শতকাজে ব্যস্ত থেকেও এবং প্রবালদের বাড়িতে যাতায়াত কমিয়ে দিলেও প্রবালের একটা চাকরির কথা—ভালো চাকরি—তাঁর মনে থাকে সব সময়েই।

অক্সব্রিজ মিটারের নাম সরকারী সলিসিটর প্যানেলে আছে। সরকারী কিছু কিছু বড়ো কর্তার সঙ্গে তাঁর সেই সূত্রে আলাপও আছে। তাঁদের কেউ কেউ যখন দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন মফস্বল করতে তখন মাঝে মাঝে পার্টি-টার্টিও দিয়ে থাকেন। তেমনি একটি পার্টিতেই তিনি নিখিল ভারত অণ্ড প্রজননী বোর্ডের চেয়ারম্যান-কম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ ভূতযোনিকে প্রবালের কথাটা বলে ফেললেন।

ভূতযোনি কলকাতায় একবার এলে আর চট করে যেতে চান

না। স্থানীয় আপিস পরিদর্শন তাঁর একদিনের মধ্যে হয়ে গেলেও জনসংযোগ, ইত্যাদি মূল্যবান কাজের জন্যে তাঁকে আরো পাঁচ-সাত দিন থাকতে হয়। আর এই জনসংযোগের কাজটার খুব চাপ পড়ে শীতকালে—নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে; ভূতযোনি সাহেব এ-সময় প্রতি মাসেই অন্তত একবার করে কলকাতায় আসেন।

ভূতযোনির কলকাতার আপিস বড় নয় খুব। পূর্ব ভারতে ওঁর অণ্ড প্রজননী বোর্ডের কাজ খুব একটা সন্তোষজনক নয়। সেজন্যে আজ অবধিও উনি কলকাতা শহরে বোর্ডের নিজস্ব কোন ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারেন নি। সরকারী পয়সায় হোটেলে থাকা পোষায় না—তা ছাড়া, এ তো আর প্রি-ওয়র ডেজের কলকাতা নয়। এখন ক্যালকাটা ইজ টেরিবলি কস্টলি। আর অস্টারিটি প্র্যাকটিস করবার জন্যে লোকে কলকাতায় আসে না। স্বর্গে গিয়ে কি কেউ প্রায়োপবেশন করে? নন্দন কাননে মন্দার গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসে থাকে? স্বর্গে অমৃতের ফোয়ারা বয়, লোকে তা পান করে আকণ্ঠ, সুরসুন্দরীদের নৃত্যগীত-হাস্য-লাস্য উপভোগ করে, অনন্ত যৌবন পায়। এ-আনন্দের আস্বাদ পেতে গেলে সর্বপ্রথম চাই একটি আস্তানা। খতাই মিত্তির সে প্রয়োজন মিটিয়েছেন ওঁর। কলকাতা শহরে এক দরাজ-দিল ভদ্রলোক আছেন খতাই মিত্তিরের বন্ধু। তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য বন্ধুচিত্ত-বিনোদন। তিনি বিত্তবান, হৃদয়বান, অতিথিবৎসল। তাঁর বাড়িতে আশ্রিত ও বন্ধুজনের অবারিত দ্বার। বাড়ি ছাড়াও তাঁর একটি ফ্ল্যাট আছে পার্ক ষ্ট্রীটের এক সুউচ্চ সৌধে। সেটা তাঁর বহিরাগত বিশিষ্ট বন্ধুদের জন্যে। সেখানে অত্যুত্তম আশ্রয় ও অতুলনীয় আহার্যের ব্যবস্থা আছে। নিস্বার্থ অতিথিসেবা নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত নয়, কিন্তু স্বার্থলেশহীনও তিনি অনেক ক্ষেত্রে। যাচিত ও অযাচিত পরোপকার তিনি অনেক করে থাকেন, যার জন্যে লোকে তাঁকে বলে অনাথের নাথ। তাঁর পৈতৃক নামটা এখন আর সাধারণ্যে প্রচলিত নয়—পরিচিতজনের

তিনি কল্পতরুদাদা। ভূতযোনি তাই কলকাতায় এলেই কল্পতরুদাদার ফ্ল্যাটে থাকেন, যেখানে নিয়মানুযায়ী সকালের ব্রেকফাস্ট স্বয়ং ফ্ল্যাটের মালিক এসে খাইয়ে যান অতিথিদের।

খতাই মিত্তির যখন ভূতযোনিকে প্রবালের কথাটা পাড়লেন তখন ভূতযোনির মনের ধারণশক্তি অন্তর্হিত। পার্টিটা 'মোরগপুচ্ছ' হওয়ায় সেখানে না ছিলো ভর্জিত অথবা শূলপক্ক মোরগ-মুরগী, না ছিলো অপর কোনো আমিষ অথবা নিরামিষ খাদ্য। তিন ঘণ্টাব্যাপী নির্জলা তরল পদার্থ গলাধঃকরণে কোন যোনিসম্ভবের আর স্বাভাবিকতা বজায় থাকে! তিনি তাই কোনক্রমে বললেন—মিটর দোস্ত, ই সব কল্ ব্রেকফাস্টমে বোলনা, অভী নেই।···মিটার দোস্ত-এর বড় ছেলে ভূতযোনির সমবয়েসী।

পরদিন রোববার। লেট ব্রেকফাস্টে বসেছেন ভূতযোনি। খতাই মিত্তির আর কল্পতরুদাদা সঙ্গী। কফিতে আসতেই খতাই মিত্তির প্রবালের কথাটা আবার পাড়লেন। মোটামুটি ওর পরিচয় শেষ করতেই সূত্র ধরলেন কল্পতরুদাদা। দাদা কিন্তু আগে জানতেনও না প্রবালের ব্যাপারটা। কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হবার পাত্র উনি নন। লোকের উপকার—সে-লোক পরিচিত, অর্ধপরিচিত বা অপরিচিতই হোক—দাদার সহজাত স্বভাব। খাঁটি, আদি কলকেতিয়া ভাষায়—যাতে তিনটে বর্ণ-শ ষ স-দন্তে আশ্রয় নেয়—তিনি বললেন—ভূতযোনি সাহেব, ওর একটা ব্যবস্থা আপনার করে দিতেই হবে। ওরা হলো গিয়ে আসল রইস আদমি। জোড়া-সাঁকো পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি, চোরবাগানের মল্লিক, কলুটোলার স্যান, ঝামুলিটোলার মিত্তির, আর ঐ ভবানীপুরের চৌধুরী,—এরা সব হলো আসল অ্যারিস্টোক্রাট। আপনাকে আর এ সব কি বলবো। আপনি, স্যর, দয়া করে একটু···।

ছি, ছি, কী বলছেন, দাদা! আপনাকে ওভাবে বলতে হবে কেন? আপনি হুকুম করবেন। বেশ লজ্জিত হয়ে বলেন ভূতযোনি।

না, আমি প্রার্থী, আপনি দাতা। হাতজোড় করে বলেন দাদা।

Ah ! what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg···টাগোরের কবিতা মনে করিয়ে দিলেন, দাদা।—ভূতযোনি অণ্ড-প্রজননের বড়োকর্তা হলে হবে কি, লেখা-পড়া এককালে ভালোই শিখেছিলেন।

না, আমি বেগার। আপনারা রাজপুরুষ। আমি অধম হতে অধম, দীন হতে দীন।—লেখাপড়া দাদাও এককালে শিখেছিলেন।

নাঃ। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। সলিসিটর, হেল্‌প মি। খতাই মিত্তিরের শরণাপন্ন হন ভূতযোনি সায়েব।

আমি আপনাকে সাহায্য করবো আপনি যদি আমার ওয়র্ডকে সাহায্য করেন।—হেসে বলেন সলিসিটর মিটার।

আচ্ছা, আচ্ছা। শুনুন, আমি ভেবে রেখেছি। আপনার ও ছেলেটি তো রিসার্চ করতে চায়। একটা কাজ হয়তো হতে পারে ওর। একটা প্রজেক্ট আছে গবর্নমেন্টের। বলছি শুনুন।—সিগরেট ধরান ভূতযোনি। সলিসিটর উৎকর্ণ হন, কিন্তু দাদা তখন নজর দেন অন্যদিকে—ফ্ল্যাটের দিকে। ওঁর কাজ শেষ হয়েছে। এখন কথাবার্তা বলুক ওরা।

হাঁস-মুরগীর ডিম নিয়ে আমরা এতদিন কাজ করছিলাম। এখন একটা নতুন জিনিস নিয়ে রিসার্চ করা হবে। কচ্ছপের ডিম। বলেন ভূতযোনি।

কচ্ছপের ডিম! কী হবে ও দিয়ে?—হেসে বললেন মিত্তির।

খাদ্য হবে। গম্ভীর গলায় বললেন ভূতযোনি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কচ্ছপের ডিমের ফুড-ভ্যালু অসামান্য। আমাদের দেশে কচ্ছপের সংখ্যাও সীমাহীন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কচ্ছপেরা যে ডিম পাড়ে—একসঙ্গে এক একটা কচ্ছপ বিশ-তিরিশ-চল্লিশটা ডিম পাড়ে—তার শতকরা নিরানব্বইটা শেয়াল,

বেজি, ইত্যাদিতে খেয়ে ফেলে। কচ্ছপের ডিম দেখেছেন তো? বড়ো বড়ো গোল গোল—আপনাদের রস্‌গুল্লার মতো।...

আচ্ছা—বাধা দেন মিত্তির—কচ্ছপের ডিম শতকরা নিরানব্বুইটা যদি শেয়ালেই খায় তাহলে ওদের বংশবৃদ্ধি হয় কী করে?

ঐ ওয়ান পার্সেণ্টেই হয়। আমাদের দেশে কচ্ছপের সংখ্যা অনেক। মাদ্রাজের সংখ্যাতত্ত্ববিদরা এক প্রাথমিক সমীক্ষায় অনুমান করেছেন যে একমাত্র মাদ্রাজ, অন্ধ্র আর কেরালাতেই কমসেকম লাখ পাঁচেক কচ্ছপ আছে। কেরালার কচ্ছপেরা মোটা মোটা, কিন্তু ডিম পাড়ে কম। অন্ধ্রের কচ্ছপেরা চওড়া ধরণের—ডিম পাড়ে মাঝারি ধরণের। মাদ্রাজের, বিশেষ করে, কাবেরী নদীর কচ্ছপেরা, দেখতে তেমন বড়ো নয়, কিন্তু অজস্র ডিম পাড়ে। উত্তর ভারতে কচ্ছপের সংখ্যা কম, কিন্তু যা আছে তা বিশালকায়। পশ্চিম ভারতেও ততো নেই। পূর্ব ভারতে জলাশয় বেশি, কচ্ছপের সংখ্যাও, ধরে নিতে পারি, বেশী। তাছাড়া, পূর্ব ভারতের কচ্ছপের ডিম মনে হয় বেশি সুস্বাদু হবে কারণ মিষ্টি জলের কচ্ছপ এখানে। এখানকার মছলি দেখুন না। আমাদের অণ্ড প্রজননী বোর্ড ঠিক করেছে কচ্ছপের ডিম সংক্রান্ত গবেষণা পূর্ব-ভারতে সরাসরি ডিপার্টমেণ্টের হাতে নেওয়া হবে। ওটা একটা ইনডিপেনডেণ্ট ইউনিট হবে। ওর জন্যে দিল্লিতে একজনকে চার্জ দেওয়া হবে। মোটামুটি লোক ঠিক হয়েও গেছে—মাদ্রাজের ঐ সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ভালো স্ট্যাটিসটিস্যান। কলকাতায় আমরা ভাবছি একটা ছোট্টো ইউনিট করবো। তার জন্যে প্রথমে আপিস করতে হবে একটা। গোড়ার দিকে একজন দুজন লোক নিয়ে আপিস করা হবে। তারা দিল্লিতে ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, পেপার ওয়ার্ক করবে, প্রিলিমিনারি সার্ভের ভারও দেওয়া যেতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে স্ট্যাটিসটিস্যান, এক্সপার্ট·· নিয়োগ করা হবে। ঐ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আমার হাতে। ভাবছি,

সিমলা যাবার আগেই আমি ওটা করে দিয়ে যাবো। পরে হলে আর হবে না। কারণ, দিল্লিতে যিনি চার্জে আসছেন তিনি বোর্ডের আণ্ডারে হলেও কাজকর্মে হবেন প্রায় স্বাধীন।···

আপনি সিমলা যাবেন কেন? জিজ্ঞেস করেন মিত্তির।

ও, আপনাকে বলা হয়নি, সিমলায় আমার হেডকোয়ার্টার্স চলে যাচ্ছে। তখন কিন্তু আর সহজে কলকাতা আসা সম্ভব হবে না।

দাদা এতোক্ষণ অন্যদিকে নজর দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—বললেই হলো! কলকাতায় আপনাকে আসতেই হবে। না এলে ছাড়বোই না আপনাকে।

ভূতযোনি মৃদু হাসলেন।

তা প্রবালকে আপনি কোথায়, কীভাবে ফিক্স করতে চান? কাজের কথায় আসেন পিসেমশাই।

ওকে যদি প্রাথমিকভাবে, সাময়িক, কলকাতা আপিসের চার্জ দেওয়া যায়। একজন অফিসর, একজন কেরানি-কম-টাইপিস্ট, একটা বেয়ারা। এখন হয়তো মাইনেপত্তর সামান্যই দেওয়া হবে, পোস্টও হবে টেম্পোরারি। কিন্তু কাজকর্ম বেশ কিছুটা আরম্ভ হয়ে গেলে আপিসও বাড়বে, তখন সুবিধে মতো জায়গায় ওকে ফিক্স করা যাবে। ওর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার তো ভালো।—বলেন ভূতযোনি।

অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ভালো। কিন্তু, ও-কাজে তো চাই বায়োলজি কি জুওলজি জানা লোক। নাকি ওটা পিসিকালচারের মধ্যে পড়ে?

ওটা কোন বিদ্যের আওতায় তা ভূতযোনিরও সঠিক জানা নেই। উনি বলেন—যে কালচারের মধ্যেই পড়ুক, ওর তাতে আটকাবে না। ওর জেনারেল কোয়ালিফিকেশন আছে। ইকনমিক্স পড়েছে, স্ট্যাটিসটিক্সও পেপার ছিলো বললেন—আবার কী? আর, প্রথমে তো যোগাযোগের কাজই বেশি। তারপর চালাক

ছেলে, নতুন কর্তার সঙ্গে যদি ভালো র‍্যাপোর্ট স্টাবলিশ করতে পারে তো কথাই নেই। দেখুন, আপনি যদি রাজী থাকেন, আর ও যদি রাজী থাকে, তাহলে ব্যবস্থা করি আমি। মাসখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলি।

দেখুন, এসব একস্ট্রা টেমপোরারি ডিপার্টমেন্ট—কিছুদিন বাদে—দু-তিন বছর পরে—যদি উঠে যায়, তখন ও কী করবে? বয়েসও চলে যাবে। খোলাখুলি বলেন পিসেমশাই।

ডিপার্টমেন্ট উঠবে কি? আর উঠলেও অন্য বেটার জায়গায় এবসর্বড হবে। তা ছাড়া, আমি রয়েছি না?

তুমিই বা ক'দিন! মনে মনে বললেন পিসেমশাই। প্রকাশ্যে বললেন—আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমার কিছুই বলবার নেই। যদি হয়ই একটু তাড়াতাড়ি তাহলে…।

আমি দিল্লি ফিরেই নোট দেবো। ফুডের 'ব্যাপারে, জানেন তো, এখন সবকিছু তাড়াতাড়ি হবে। টপমোস্ট প্রায়োরিটি। আর কচ্ছপের ডিমের আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। কে জানে হয়তো দু-এক বছরের মধ্যে ওটাই আমাদের একটা বড়ো ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নার হবে—চা, কলা, কাজু বাদামের মতোই। আমি চেষ্টা করলে, মনে হয়, নেক্স্ট মান্থ থেকেই কলকাতার আপিস চালু করে দিতে পারবো। আমি দিল্লি গিয়ে জানাবো আপনাকে। আরেকটা সিগরেট ধরালেন ভূতযোনি।

আমরা তালে এবারে উটি—বললেন কল্পতরুদাদা। আপনার আজ লাঞ্চ কোতায়?

মোসাম্বোতে। মিঃ চুরি দিচ্ছেন।

একমাস নয়, দুমাস বাদে কলকাতায় নিখিল ভারত অণ্ড প্রজননী পর্ষতের কূর্মাণ্ড শাখা অফিসের উদ্বোধন হলো। অণ্ড প্রজননী পর্ষতের একটা কামরা পার্টিশান করে দুভাগ করা হলো।

একভাগ ভারপ্রাপ্ত অফিসরের জন্যে, অপর ভাগে কেরানি-কম টাইপিস্ট ও বেয়ারা। প্রবালই ভারপ্রাপ্ত অফিসর হলো। কাগজে লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিলো, দরখাস্ত পড়েছিলো অনেক, একটা ইন্টারভিয়্যুর অনুষ্ঠানও হয়েছিলো। তাতে ওর চাকরি পাওয়া আটকায়নি। ইন্টারভিয়্যু নিতে মিঃ ভূতযোনি ও অফিসর অন স্পেশ্যাল ডিউটি, কূর্মাণ্ড শাখা,—মিঃ কূর্মলিঙ্গম এসেছিলেন। ইন্টারভিয়্যুতে প্রবালকে শেক্‌সপীয়রের কবিতা, অ্যামেরিকার ফরেন পলিসি, চীনের জনসংখ্যা, চেরাপুঞ্জির বৃষ্টি,···ইত্যাদি অনেক মূল্যবান প্রশ্ন করা হয়। মিঃ কূর্মলিঙ্গম কর্ণাটিক রাগসঙ্গীত নিয়ে হেসে প্রশ্ন করেই বললেন, না, অতো কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করাটা তাঁর সঙ্গত হয়নি। হাসিটা টেনেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন কূর্ম শব্দের অর্থ প্রবালের জানা আছে কি না। জবাবে কূর্ম অবতার অবধি উল্লেখ করলো প্রবাল এবং সেই প্রসঙ্গেই কূর্মলিঙ্গম জানালেন ওঁর নাম কূর্মলিঙ্গম হলো কী করে। ওঁদের বাড়ীর কাছেই কাবেরী নদী এবং ওঁর জন্মের দিনেই নাকি নদী থেকে একটি প্রকাণ্ড সুলক্ষণা কূর্ম উঠে এসে ওঁদের বাগানে ডিম পেড়ে রেখে যায়। আরো জানালেন ছেলেবেলা থেকেই কচ্ছপে ওঁর আগ্রহ এবং এই যে আজকে সরকার কূর্মাণ্ড-প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এর মূলে হলো 'দ্রাবিড়' পত্রিকায় ওঁর এ-বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

সাড়ে তিনশো টাকা কনসলিডেটেড মাইনে প্রবালের। আপিসে জয়েন করবার পরে ওর ঘর, চেয়ার-টেবিল-আলমারি ঠিক হলো। কেরানি আর বেয়ারা এলো অণ্ড-প্রজননী আপিস থেকে। সকলেই টেম্পোরারি।

পিসেমশাই এবারে আগে থাকতে কিছু বলেননি, একদিন শুধু বলেছিলেন একটা দরখাস্ত করতে, আর ইন্টারভিয়্যুর আগের দিন বলেছিলেন, এ চাকরি নিয়েও তুমি অন্য পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে পারবে। প্রবালও তাই ভেবেছিলো, মাঝারি ট্যুশনি দুটো ছেড়ে

দিয়ে এই চাকরি করলে কিছুটা পয়সা বেশি পাবে, আপিসের অভিজ্ঞতা হবে, হয়তো একটা অন্য ধরণের রিসার্চও করে ফেলতে পারে। সর্বোপরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার বাধা নেই। দ্বিরুক্তি করেনি তাই পিসেমশায়ের কথা মেনে নিতে। তাছাড়া, বলতে গেলে, পিসেমশাই-ই গার্জিয়ান। ঝাপ্‌পড়দের ব্যাপারের পরেও তো উনি আবার চাকরি দেখে দিলেন এবং বেসরকারি চাকরি নয় এবারে।

সপ্তাহখানেক কেটে গেলো— কোনো কাজ নেই হাতে। দশটায় আপিসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। অণু-প্রকল্পের তিনজন অফিসর আছেন—সকালের দিকে কথা বলতে গিয়ে দেখে তাঁরা আসেননি ; দুপুরের দিকে কথা বলতে গিয়ে শোনে তাঁরা লাঞ্চে গেছেন ; বিকেলের দিকে কথা বলতে গিয়ে শোনে তাঁরা ফিল্‌ড ওয়ার্কে বেরিয়েছেন। ও-আপিসের বড়োবাবুই ওর চেয়ার-টেবিল, ইত্যাদি ঠিক করে দিলেন, একটা চিঠিও পাঠিয়ে দিলেন প্রবালের টেলিফোনের জন্যে।

তারপর সেদিন এলো অফিসর অন স্পেশ্যাল ডিউটির কাছ থেকে এক পঁচিশ পাতা নোট। অফিসের নিয়ম-কানুন, অফিসরের কাজের ফিরিস্তি, কেরানি-টাইপিস্ট-বেয়ারার কাজ, কতগুলো কোন কোন বিষয়ে ফাইল খুলতে হবে এবং বর্তমানে কাজের পদ্ধতি, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, ইত্যাদি। ক'দিন বাদে এলো এক চিঠি, তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে (পূর্ব ভারতের) মিঃ কূর্মলিঙ্গম যে চিঠি লিখেছেন তার কপি। মিঃ কূর্মলিঙ্গম বলেছেন, পনের দিন বাদে ঐসব রাজ্য সরকারকে রিমাইণ্ডার দিতে হবে। আর ইতি-মধ্যে স্থানীয় স্ট্যাটিসটিকল ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করে পূর্ব-ভারতের, বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে, কলকাতা ও তার আশপাশের নদী ও জলাশয়ের পরিসংখ্যান যোগাড় করতে হবে। আর স্থানীয় জীববিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে

হবে পূর্বভারতের কচ্ছপেরা কী নিয়মে ডিম পাড়ে, কী রকম জায়গায় ডিম পাড়ে, ইত্যাদি।...এই তো কাজ এসে গেলো। টাইপিস্টকে ডেকে, বেয়ারাকে ডেকে, চিঠির মর্ম বললো ও এবং ঠিকমতো সব ফাইলপত্তর খুলতে বললো। কতকগুলো চিঠিও লিখলো নানান জায়গায়; তার মধ্যে একটা টেলিফোন অফিসে—টেলিফোনটা না হলে আর চলছে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখা করলো ওদের পাড়ার জীববিজ্ঞানী মহেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হাসি-হাসি মুখে সব শুনলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। তারপর বললেন, কচ্ছপের তো বহু স্পিসিস—তোমার বড়োকর্তা তো তার কোনো উল্লেখ করেননি। আর কচ্ছপের ডিমের চেয়ে ওর মাংস নিয়ে মাথা ঘামালেই তো ভালো হতো। খেয়েছো কখনও কচ্ছপের মাংস? না। জিজ্ঞেস কোরো কোনো বাঙাল-দেশের লোককে—কোনো বরিশালের লোককে। হ্যাঁ, তোমাকে কয়েকখানা বই আমি প্রেসক্রাইব করে দেবো। তুমি একদিন দুপুর বেলা ইউনিভার্সিটিতে এসো। সময় আছে নিশ্চয়ই তোমার।

পরদিন আপিসে গিয়ে কেরানিবাবুকে জিজ্ঞেস করলো প্রবাল; আচ্ছা, বরিশালের লোক কাউকে চেনেন?

কেরানিটি ছেলেমানুষ—ওরই বয়েসী হবে। কথায় কথায় হাসে। বললো, বুঝেছি কেন। কচ্ছপের মাংসের কথা জিজ্ঞেস করবেন তো। আমার বাড়ি অবিশ্যি বরিশালে নয়, তবে কচ্ছপ আমি খেয়েছি। বরিশালের লোক তো এখানেই আছে—আমাদের পূর্ণ।

পূর্ণ বরিশালের লোক—জানতাম না। ডাকুন তো পূর্ণকে। বেচারি প্রবাল! শেয়ালদহ পেরিয়ে ও একমাত্র গিয়েছে দমদম। পূর্ববঙ্গ আর আলাস্কা ওর কাছে সমান।

পূর্ণ বেয়ারা এলো সিতাংশুর সঙ্গে। কেরানির নাম সিতাংশু।

কচ্ছপ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা পূর্ণ—খেয়েছো কখনও কচ্ছপের মাংস ?—মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

ছার, আমাগো ছ্যাশ বইরশাল। কাউডা খায় নাই এমন লোক ঐহানে নাই। দাঁত বার করে বলে পূর্ণ—শীর্ণদেহ বৃদ্ধলোক।

কাউডা—কাউডা আবার কি! কচ্ছপকে কাউডা বলে?—ছেলেমানুষের মত বলে ওঠে প্রবাল।

যেই কচ্ছপ মাইনষে খায় হের নাম কাউডা। ছুট ছুট, গায়ের রং সুন্দর, পিঠের উপরে কাঁটা। একবার বরযাত্রী গ্যালাম কমল-কাড়ি। ফেরনের সময় সস্তা দেইখা পাড়া কেনলাম কয়ডা। নৌকায় ফিরতে আছি এমন সময় দেহি জাউল্যারা যায় অনেকগুলি কাউডা লইয়া। পাড়া ফেইল্যা কাউডা লইলাম।

বটে! রূপকথা শুনছে প্রবাল।

আমি বরিশালের লোকের কচ্ছপ প্রীতির একটা গল্প জানি। সত্যি গল্প। বলে সিতাংশু। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসনস্ জাজ। ছেলেরা সব মস্ত মস্ত চাকুরে—কেউ জজ, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ প্রফেসার। বাপ মৃত্যু-শয্যায় খবর পেয়ে সব ছেলেমেয়ে তাদের পরিবার নিয়ে বাড়ি এসেছে—কলকাতা, দিল্লী, পাটনা, মুঙ্গের থেকে। বাবার মৃত্যু-শয্যার চারপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে ছেলেরা—আপনার কী খাইতে মন যায়?

অনেকবার জিজ্ঞেস করবার পর বাপ চিঁ চিঁ করে বললেন—বাবাজী, একডা কাউডানি খাওয়াইতেয়ার?—হেসে ফেললো সিতাংশু।

ননসেন্স! বললো প্রবাল, বলেই হেসে ফেললো শব্দ করে। পূর্ণর মুখেও তখন আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি।

আচ্ছা, পূর্ণ, বলে প্রবাল, বলতে পারো, কচ্ছপেরা সাধারণত ডিম পাড়ে কখন?

হেই বর্ষাকালেই বেশি পাড়ে। বর্ষার জল পড়লেই দেহা যায় কাউডার বাচ্ছা সব মাড-ঘাড-উডান দিয়া বুকে হাঁটিয়া যায়।

একটা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলো।

আচ্ছা, ঐ চিঠি দুটো টাইপ করা হয়েছে? জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

হ্যাঁ। ও তো কালকেই হয়ে গেছে। জবাব দেয় সিতাংশু।

পূর্ণ, তুমি ঐ চিঠি দুটো লাগিয়ে এসো। আপিসের ভাষা শিখে গেছে প্রবাল।

আচ্ছা, ছার।

পূর্ণ চলে যেতেই সিতাংশু বলে—স্যার, আমি আজ একটু সাড়ে তিনটের সময় চলে যাবো।

কেন?

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। সিতাংশু অকারণে হাসে।

এতো তাড়াতাড়ি যাবেন কেন? খেলা তো সেই কটায়—

পাঁচটায়। আগে না গেলে অসুবিধে হয়, স্যার। তাছাড়া কাজও তো নেই হাতে। আপনিও তো, স্যার, সাড়ে তিনটেয় চলে যেতে পারেন। প্রবাল শক্তভাবে ওর দিকে চাইতেই বলে —মানে, ফিলড্ ওয়ার্কে চলে যেতে পারেন। এই তো ও অফিসের সব অফিসাররা সাড়ে তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা। আমরাই শুধু পাঁচটা অবধি থাকি।

একটুক্ষণ কথা বলে না প্রবাল। তারপর বেশ মিঠেকড়া সুরে বলে, আপনি আজকে যেতে পারেন। কালকে থেকে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

সেদিন থেকে খুব ঘোরাঘুরি শুরু করলো প্রবাল। পরিসংখ্যান দপ্তরে, রাজ্য সরকারের দপ্তরে, ইউনিভার্সিটি, স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিট্যুটে। যেখানেই যায় কিছু-না কিছু নোট করে নিয়ে আসে। সেগুলো টাইপ করতে দেয় সিতাংশুকে। সিতাংশু হাসতে হাসতে

টাইপ করে সেগুলো। প্রবাল ভেবে পায়না সব সময় ওর মুখে অতো হাসি কেন।

মাসখানেক কেটে গেল। এর মধ্যে যা যা সংবাদ সংগ্রহ হয়েছে তার ভিত্তিতে অনেক রিপোর্ট পাঠালো ও দিল্লিতে। এমন কি মহেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার রিপোর্টও। অনেক-গুলো ফাইল খুলিয়েছে। রাজ্য সরকারগুলোকে সাতদিন অন্তর রিমাইণ্ডার পাঠাচ্ছে, কচ্ছপ সম্পর্কে যেখানে যা তথ্য পাচ্ছে সব টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে মিঃ কূর্মলিঙ্গমকে। হঠাৎ একটা চিঠি এলো মিঃ কূর্মলিঙ্গমের···আগামী সপ্তাহের বুধবারে আমি কলকাতা পৌঁছব ম্যাড্রাস হয়ে। ট্রেন সকাল সাতটা পনেরয় হাওড়া পৌঁছবে। স্টেশনে উপস্থিত থাকবে। একখানা গাড়ি রাখবে। একটা ভালো হোটেলে দিন সাতেকের জন্য ঘর বুক করবে একটু রিজনেবল কস্ট-এর মধ্যে। আমার ইচ্ছে আছে কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক করবার। মোর হোয়েন উই মীট।

খবরটা সবাইকে জানালো প্রবাল। অণ্ডপ্রজননী পর্ষতের অফিসরদের বললো ওঁদের জিপখানা দু-একদিনের জন্যে ধার দিতে। ওঁরা রাজী হলেন না। ওঁদের অনেক কাজ এখন।

পিসেমশাইকে গিয়ে বললো প্রবাল। পিসেমশাই বললেন—বড়ো অসময়ে আসছে কূর্ম। ঐ সময়ে দাদার ফ্ল্যাটে থাকবে মিঃ চৈনানি—ননফেরাসের কত্তা। তা ওর তো খুব বড়ো হোটেল চলবে না—'চার্লটন' ঠিক করে দিই। টাকা তিরিশেকে হয়ে যাবে —দিন তিরিশ টাকা। আর গাড়ি? তা, ও তো সকালে আসছে —আমার গাড়ি নিয়ে যাস। ওকে হোটেলে পৌঁছে চলে আসবে গাড়ি। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ওকে আসতে দে না।

আজ সেই বুধবার। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রবাল পিসে-মশাইয়ের বাড়ি চলে গেল। ওখানে গিয়েই চা খেল। ইতিমধ্যে

পিসতুতো ভাই হাওড়া এনকোয়ারিতে টেলিফোন করে জানলো, ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট। সর্বনাশ! এখন কী করা যাবে। গাড়ি তো ঐ সময় পিসেমশাইকে নিয়ে টেম্‌পল চেম্বারে যায়। পিসেমশাই সুরাহা করলেন। বললেন, তুই খেয়েদেয়ে চলে আয়। আমি না হয় আজ একটু আগেই বেরুবো। আমাকে ড্রপ করে তুই গাড়ি নিয়ে চলে যাস। ওকে একেবারে হোটেলে পৌঁছে গাড়িটা ছেড়ে দিস।

পৌনে দশটায় বেরুবার সময়ে প্রবাল আবার টেলিফোন করলো হাওড়ায়।...ম্যাড্রাস মেল অ্যারাইভড জাস্ট নাউ। সর্বনাশ! হয়ে গেল! মিঃ কূর্মলিঙ্গম এতোক্ষণ হাওড়া স্টেশনে বসে বসে কী করবেন, এই সর্বনাশা চিন্তা ওকে সারা পথ আচ্ছন্ন রাখল।

কাউডা খায় নাই এমন লোক ঐ হানে নাই।··

হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছল প্রবাল, তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে তের নং প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেখে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। কী হলো, কোথায় গেলেন ভদ্রলোক!

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ওঁকে পাওয়া গেল হুইলারের দোকানের সামনে। বাক্সো-বিছানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম। একখানা Mysindia হাতে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। মুখখানা এমনিতেই লম্বা, তা আরো লম্বা হয়ে পড়েছে। মুখ কাঁচুমাচু করে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় প্রবাল।

টেরিবলি সরি, স্যর। হাওড়া এনকোয়ারি গেভ রং ইনফরমেশন।

এভরিথিং ইজ রং ইন ক্যালকাটা, আই সাপোজ। মোটা ঘ্যাসঘেসে গলায় বললেন কূর্মলিঙ্গম।

জবাব দেয় না প্রবাল। একটু বাদে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বলেন কূর্মলিঙ্গম—হাউ লং আই হ্যাভ টু ওয়েট হিয়ার—টিল ফোর ও' ক্লক ?

সরি, স্যর। লেটস্ গো।—অপ্রতিভ হয় প্রবাল।

কুলি কাছেই ছিলো। মাল নিয়ে চলতে শুরু করলো ওদের সঙ্গে।

হাওড়া ব্রিজের মুখে এসেই দাঁড়িয়ে গেলো গাড়ি, ব্রিজের উপর মারাত্মক ট্রাফিক জাম। মিনিট পাঁচেক থেমে থাকবার পর জিজ্ঞেস করলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম—হোযাটস্ দ্য ট্রাবল ?

ট্রাফিক জাম।—বলে প্রবাল।

ইউ সি, হাউ কারেক্ট আই ওয়াজ ইন টেলিং এভরিথিং ইজ রং ইন ক্যালকাটা। সারারাত ট্রেন জার্নি, গাড়ি লেট, ওয়েটিং অ্যাট দ্য স্টেশন, অ্যাণ্ড নাউ দ্য নটোরিয়াস ট্রাফিক জাম অব ক্যালকাটা ! জানিনা হোয়াট মোর ইজ ইন স্টোর ! —কপালের ঘামের মতোই টপটপ করে ওঁর রাগ গলে গলে পড়ে।

মায়া হয় প্রবালের। সত্যি, খুব কষ্ট হচ্ছে বেচারির।

মিনিট পনেরর মধ্যেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলো। সৌভাগ্য।

একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম—হোটেল ঠিক করা হয়েছে ?

হ্যাঁ, স্যর।

কেমন হোটেল—এ ক্লাস ?

এ ক্লাস, তবে এ-ওয়ান নয়।—মৃদু হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে প্রবাল।

রেট কি রকম ?—কূর্মলিঙ্গম সমান গম্ভীর।

রোজ তিরিশ টাকা।

তিরিশ টাকা! মাদ্রাজে পনের টাকায় ডিসেণ্ট হোটেল।

ইওরোপীয় স্টাইল নয় নিশ্চয়ই।—জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

জবাব দিলেন না কূর্মলিঙ্গম।

একটু বাদেই হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেলো ওরা।

সীমস্ টু বি এ স্মল স্ট্যাবলিশমেণ্ট। বলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম।

নট কোয়াইট স্মল, বলে প্রবাল। এণ্ড অব কোর্স ডিসেণ্ট।

হোটেলের ঘরে ঢুকে খুশি হন কূর্মলিঙ্গম। আচ্ছা, চাউধ্রি, আমি এখন স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করবো। তুমি বিকেলের দিকে, সে, অ্যাট অ্যাবাউট, থ্রি, গাড়ি নিয়ে এসো।

অল রাইট, স্যর। বেরিয়ে আসে প্রবাল।

আপিসে এসে প্রবাল বলে, মিঃ কূর্মলিঙ্গম বেলা তিনটেয় আসছেন। অণ্ড-প্রজননী পর্বতে গিয়ে আবার খোঁজ করে তিনটের সময়ে ওদের জিপখানা পাওয়া যাবে কি না। না, পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রবাল তিনটের সময় হোটেলে গিয়ে দেখে মিঃ কূর্মলিঙ্গম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। একঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে আসে আপিসে। সাড়ে চারটের সময় পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন করে চার্লটন হোটেলে। সেখান থেকে খবর পায়—মিঃ লিঙ্গম এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। প্রবাল তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে। আপিসে ওদের থাকতে বলে যায়।

মিঃ কূর্মলিঙ্গম বলেন—বড়ো টায়ার্ড ছিলাম। তা তুমি আমাকে জাগালে পারতে। যাক গে, আজ আর আপিসে যাওয়া হলো না।

কালকে যাবো। এ হোটেলের খাবার ভালো না। সো ফার আমি তোমাদের ক্যালকাটার কোন কিছুই ভালো দেখছিনে।

চুপ করে থাকে প্রবাল।

চলো, একটু সাইট-সিয়িং করে আসা যাক। গাড়ি এনেছো তো?—জিজ্ঞেস করেন কূর্মলিঙ্গম।

না, স্যর্। ওদের একখানা জীপ, তা সেখানা আবার ব্যস্ত রয়েছে কাজে। —বলে প্রবাল।

কিন্তু সকালে যে গাড়িখানা দেখলাম—ওখানা কার?

ওখানা আমার এক আত্মীয়ের। বলে প্রবাল।

ও গাড়িটা পাওয়া যায় না এখন?

ওটা তো এখন পাওয়া মুশকিল। যাঁর গাড়ি তিনি একজন সলিসিটর, ব্যস্ত মানুষ।

তাহলে চলো ট্যাক্সি নেওয়া যাক।

পাঁচটা প্রায় বাজে। এখন কলকাতা শহরে ট্যাক্সির চেয়ে বাঘের দুধ পাওয়া সহজতর।

ট্যাক্সি পেতে. গেলে আরো ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। এখন আপিস ছুটি হয়েছে সব।—বড়ো অস্বস্তি হচ্ছে প্রবালের।

হুঁ, কাগজে যা পড়ি তা সব ঠিকই তাহলে। চলো পায়ে হেঁটেই না হয় ঘুরি একটু কাছাকাছি কোথায়ও।

একটু বাদেই বেরুলো দুজনে। চৌরঙ্গী পাড়া, ময়দান। ময়দান দেখে কূর্মলিঙ্গম বলেন—সো ফিলতি! নামকরা জায়গা, বাড়িগুলো, সব হাত দিয়ে দিয়ে দেখায় প্রবাল। ম্যুজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন, মনুমেণ্ট, ফোর্ট, ওল্ড ইমপিরিয়াল লাইব্রেরী, মায় মেট্রো সিনেমা। তারপর ওঁকে নিয়ে ঢোকে নিউ মার্কেটে। একটা বড়ো কনফেকশনারির সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে কেক-পেসট্রিতে ওঁর ইণ্টরেস্ট আছে কি না।

নো, নো, আই অ্যাম এ স্ট্রিকট্ ভেজিটেরিয়ান।

হাঁটতে হাঁটতে পার্ক ষ্ট্রীটে চলে যায় ওরা। ট্রিংকার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে চা অথবা কফি খাবার ইচ্ছে আছে নাকি মিঃ কূর্মলিঙ্গমের।

নো, আই হ্যাভ অলরেডি হ্যাড মাই কফি অ্যাট দ্য হোটেল। অফুল কফি! সামনে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে বলেন কূর্মলিঙ্গম—লেটস্ টেক দিস। ট্যাক্সিতে চেপে বলেন—চলো, শহরের অন্যান্য অঞ্চল দেখি।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে ঘুরে ঘুরে শহর দেখে ওরা, উত্তর-দক্ষিণের অনেক জায়গা। দু-একবার কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যান কূর্মলিঙ্গম। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন—চৌধ্রি, তুমি কোন ইয়ারে বি-এ পাশ করেছো?

প্রবাল বলে তিন বছর আগে বি-এ, আর গতো বছর এম-এ। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনি নিশ্চয়ই অনেক বছর আগে পাশ করেছেন।

কূর্মলিঙ্গম বলেন উনি ছ' বছর আগে বি-এ, পাশ করেছেন।

বিশ্বাস হয় না প্রবালের। কূর্মলিঙ্গমের দিকে ভালো করে চায়। রোগা, ঢ্যাঙ্গা, ছ'ফিটের উপরে কর্মলিঙ্গম, মাথায় কুঞ্চিত কেশ আধপাকা, খাকি ট্রাউজারস আর শাদা বুশশার্ট পরা। কতো বয়েস সায়েবের? কায়দা করে বলে—দেন ইউ আর নট মাচ ওলডার দ্যান আই।

কূর্মলিঙ্গম জিজ্ঞেস করেন প্রবালের বয়েস কতো।

প্রবাল বলে, তেইশ। আমি সাতাশ, বলেন কূর্মলিঙ্গম।

হাসি পায় প্রবালের। দেখে তো মনে হয় হয় সাতচল্লিশ বছর বয়েস। বয়েস ছেড়ে ও লেখাপড়ার কথাই জিজ্ঞেস করে।

আপনি কোন ইউনিভার্সিটির এম-এ?

একটু থেমে জবাব দেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম।···আমি এম-এ নই। বি-এ পাশ করে ক'বছর ধরে রিসার্চ করেছি।

আমাদের এখানে, জানেন, এম-এ পাশ না করে রিসার্চ করা যায় না। বলে প্রবাল।

ম্যাড্রাসের সিলেবস অনেক শক্ত, কমপ্রিহেনসিব। গ্রাজুয়েট হলেই সব জানা যায়। জবাব দেন কূর্মলিঙ্গম।

আপনি কী নিয়ে রিসার্চ করেছেন ?

অনেক বিষয় নিয়ে।

কোন সাবজেকটে ডক্টরেট আপনার ?

আমি রিসার্চ করেছি ডক্টরেট পাবার জন্যে নয়। আমার ওয়ার্কিং পেপারস নিয়ে অনেক ডক্টরেট হয়েছে।

হোটেলে ফেরবার মুখে বলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম।—ক্যালকাটার ইমপ্রেশন আমার ভালো হলো না। টেরিবলি ক্রাউডেড, ইললিট, ফিলতি। আচ্ছা, তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন ?

মা, দুই বোন, দুই ভাই, আর এক কাজিন।

ভাইবোনেরা কী করে ? বোনেরা বড়ো ?

সবাই পড়াশুনা করে। হ্যাঁ, বোনেরা বড়ো।

আমি আশা করি তোমার ফ্যামিলিতে আমাকে ইনট্রোডিউস করে দেবে।

নিশ্চয়ই। আপনি তো আছেন ক'দিন। আপনার আপত্তি না থাকলে আপনি আমাদের সঙ্গে একদিন লাঞ্চ বা ডিনার খাবেন।

সানন্দে।

হোটেলের দরজায় নেমে দ্রুতপদে উপরে চলে যান মিঃ কূর্মলিঙ্গম। মিটারে দেখে প্রবাল পনের টাকা উঠেছে। সর্বনাশ ! কূর্মলিঙ্গম কি টাকা আনতে গেলেন ?

পাঁচ মিনিটেও কূর্মলিঙ্গম ফেরেন না। ট্যাক্সিওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে উপরে উঠলো প্রবাল। কূর্মলিঙ্গম জামাকাপড় ছাড়ছেন তখন।

ট্যাক্সিওয়ালা অপেক্ষা করছে। বলে ও।

ছেড়ে দাও ওকে। মুখ না ফিরিয়েই বলেন কূর্মলিঙ্গম।

না, মানে, ফেয়ারটা আবার আমার কাছে নেই কি না। তা, আমি বরং ওটাকে নিয়ে চলে যাই।

বেশ, তাই করো। কালকে আপিসে যাবার সময় আমাকে পিক আপ করে নিও।

পরদিন প্রবালের সঙ্গে আপিসে এলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম। টেলিফোন এখনও হয়নি দেখে মহা খাপ্পা। একমাসের মধ্যেও একটা টেলিফোন হয় না। তোমরা চেষ্টা করো না নিশ্চয়ই।

টেলিফোন পাওয়া এখানে কতো মুশকিল ব্যাখ্যা করলো প্রবাল।

সহজ যে এখানে কোন জিনিসটা তা তো বুঝি না। কড়া রিমাইণ্ডার দাও ওদের।

ফাইলপত্তর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম। তারপর বললেন—ক্যালকাটার কালেকটরের সঙ্গে দেখা করে বলো আমি ক্যালকাটার ট্যাঙ্কগুলো দেখতে চাই। উনি যেন এ্যারেঞ্জ করেন।

ক্যালকাটার ট্যাঙ্কে কোন কূর্ম-জাতীয় জিনিস নেই, বলে প্রবাল।

নেই! ঠিক জানো তুমি? তাহলে ক্যালকাটার আশপাশে?

ওটা অন্য জেলার জুরিসডিকশন। চব্বিশ পরগনা।

চব্বিশ পরগণাই হোক, আর আটচল্লিশ পরগণাই হোক, অ্যারেঞ্জ করো।

আচ্ছা, যোগাযোগ করছি।

আরো দু চারটে কথাবার্তার পর উনি পাশের আপিসে গেলেন। প্রবাল গেল সঙ্গে।

অণ্ড-প্রজননীর এক অফিসর, গোপালরত্নম, সেদিন আপিসেই

ছিলো। নমস্কারম্—কূর্মলিঙ্গমকে জাতীয় প্রথায় অভিবাদন জানালো সে। দুজনের আলাপ সুরু হয়ে গেলো, বিশুদ্ধ তমিল ভাষায়। প্রবাল নির্বাক হয়ে বসে। ওর সঙ্গে কোনো কথা বলা প্রয়োজন বোধ করলো না কেউ। বেশ কিছুক্ষণ পর মিঃ কূর্মলিঙ্গম বললেন, চৌধ্রি, তুমি ঐ আটচল্লিশ পরগণার কালেকটরকে গিয়ে বলো আমার ভিজিট অ্যারেঞ্জ করতে। আমি আজ লাঞ্চ করছি মিঃ গোপালরত্নমের সঙ্গে। হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করো বেলা তিনটেয়। আরেকটা কথা—যদি সম্ভব হয় তো কিছু রসগোল্লা যোগাড় করো আমার জন্যে। আমি জানি, রসগোল্লা তৈরী এখন ব্যাণ্ড; কিন্তু আমি এ-ও জানি ও জিনিস শহরে এখনও অঢেল পাওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি তাহলে যাও।

কথাগুলো খুব ভালো লাগলো না প্রবালের। তবু, পিসেমশাইকে স্মরণে এনে, হেসে বললো—আচ্ছা।

নিজের আপিসে এসে বললো প্রবাল—আমি আলিপুর যাচ্ছি। পূর্ণ, তুমি জানো রসগোল্লা কোথায় পাওয়া যায়?

গড়িয়ায় যায় শুনছি। বলে পূর্ণ।

আনতে পারবে?

চ্যাষ্টা করতে পারি।

তাহলে, এই নাও টাকা। সামান্য গোটাকতো নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। সিতাংশুবাবু আপনি আপিসে থাকবেন। মিঃ কূর্মলিঙ্গম রয়েছেন—ওঁর দরকার হতে পারে আপনাকে।

সিতাংশু অকারণে হাসলো আবার।

আলিপুরে ডি এম—এ ডি এম—এস ডি ও জাতীয় কোনো অফিসরকেই পেলোনা প্রবাল। অনেক চেষ্টার পর বাবু-জাতীয় একজনকে বললো কথাটা। বেঁটেখাটো, রাসভারী লোকটি, কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো সে। তারপর গম্ভীর গলায় বললো—আপনারা রাঁচি ফেরৎ নন তো?

হোয়াট ডু ইউ মীন?—বনেদী পরিবারের মার্জিত ছেলে এই বোধহয় প্রথম চটলো।

ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট্ অব টোয়েনটিফোর পরগণাস আপনার রামলিঙ্গম না অশ্বলিঙ্গমের ভিজিট অ্যারেঞ্জ করবে! কে হে, মশাই, হরিদাস পাল আপনি? যান, যান, বেরিয়ে যান। দেখে তো মনে হয় শিক্ষিত—তা এটা জানেন না যে ট্যাঙ্ক সব পার্সোনাল প্রপার্টি, ডি এম-এর বাপের সম্পত্তি নয়।—মুখ ভেংচে বলে কেরাণিবাবু।

মানুষ এত অভদ্র হয়! অবাক হয়ে গেল প্রবাল।

আপিসে ফিরে দেখে পূর্ণ ফেরেনি তখনও। তিনটে প্রায় বাজে। একটু বাদেই টেলিফোন এলো মিঃ কূর্মলিঙ্গমের—গোপালরত্নমের ঘরে।

চৌধ্রি, কী হলো? তিনটে তো বাজে। সব ব্যবস্থা হয়েছে?

না, কোনো অফিসরকে পেলাম না। প্রব্যাবলি অল অন টুয়র। ক্লার্ক সেড ডি. এম ডাজণ্ট অ্যারেঞ্জ এনিবডিজ টুয়র। আর ট্যাঙ্ক সব পার্সোন্যাল প্রপার্টি। সোজাসুজি জবাব দিলো প্রবাল।

হোপলেস! আচ্ছা ইউ কম এলং। রসগোল্লা পাওয়া গেছে?

বেয়ারাকে পাঠিয়েছি—ফেরেনি এখনও।

স্প্লেনডীড! দয়া করে এসো একবার। কূর্মলিঙ্গমের কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো।

চারটের সময় ফিরলো পূর্ণ।

—এ সব বেআইনী কাম, ছার, আমাগো দিবেন না। হায় রে হায়! রসগোল্লা পাইতে জান যায়।

রসগোল্লার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় প্রবাল, ভবানীপুরের বনেদী চৌধুরী পরিবারের এম-এ পাশ অফিসর ছেলে।

রসগোল্লার ভাঁড়টা দেখে কূর্মলিঙ্গমের ভ্রূকুটি কিঞ্চিৎ কমলো। আলিপুরের বার্তা শুনে বললেন—স্টেট গবমেণ্ট এজেন্সীর কোনো

হেল্‌প পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দেখছি, ইউনিটটা ম্যাড্রাসে খুললেই ভালো হতো। ওখানে অনেকখানি প্রিলিমিনারি কাজ হয়েছে, স্টেট গবমেণ্ট কো-অপারেশন দেয়, লোক সব ইনটে-লিজেণ্ট। গোপালরত্নমের সঙ্গে পরিসংখ্যান সংস্থায় গেলাম—ওরা আমাদের এই চমৎকার প্ল্যানটা বুঝতেই পারলো না।

আহত হলো প্রবাল। ইনস্টিট্যুটে ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো।

প্রবাল বলে—আমি কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না ঠিক। জলের কচ্ছপের সংখ্যা কী করে হিসেব করা সম্ভব।

র‍্যাণ্ডম সারভে করা মোটেই কঠিন নয়। একবার মোটামুটি ওদের সংখ্যাটি জানা গেলে, এরা কোন কোন সিজ্‌নে ডিম পাড়ে, কী সংখ্যায় ডিম পাড়ে, এবং কেমন করে পাড়ে, জানা হয়ে গেলে তো বারো আনা কাজই হয়ে গেলো। তারপর হলো শুধু ডিমগুলো কালেকট করে প্রিজার্ভ করা, আর সেগুলোকে কাজে লাগানো। ফ্র্যাঙ্কলি, আমি খুব হতাশ হচ্ছি এখানকার কাজকর্মে। দেখা যাক, কালকে আমাদের নিজেদেরই বেরিয়ে পড়তে হবে। গোপালরত্নম্‌ জীপ দেবে বলেছে। দেখো তো, হোটেলের অ্যাটেনডেণ্ট কোথায় গেলো?

শেষের কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগলো প্রবালের।

কই? দেখো। আবার বললেন মিঃ কূর্মলিঙ্গম। ওর পা দুখানা যেন এঁটে গিয়েছে মেঝেতে, টেনে ছাড়াতে সময় লাগলো। ও যখন দরজার দিকে এগুচ্ছে তখন কূর্মলিঙ্গম বললেন, হ্যাঁ শোনো, কাইণ্ডলি আমার একটু উপকার করো। দ্রাবিড় পত্রিকা কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করে আমাকে আজ, গতোকাল, পরশুর কাগজ এনে দাও। দ্যওনলি পেপার আই লাইক—দ্য বেস্ট পেপার।

আমি তো জানিনে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলে প্রবাল, ও কাগজ ঠিক কোথায় পাওয়া যায়।

এঃ, তুমিও ঠিক হোটেলের বেয়ারার মতো কথা বলছো। যে কোনো পেপারওলার কাছেই পাবে। আমি জানি ও-কাগজ কলকাতায় অনেক কপি আসে।

পা দু'খানা আবার এঁটে যায় মেঝেতে। ছাড়াতে সময় লাগে। ছাড়িয়ে নিয়েই বেরিয়ে যায় বারান্দায়। সেখানে বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে তাকে ঘরে যেতে বলে ও চলে যায় কাগজের স্টলে। দু-তিন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরে জোটে কাগজ। অনেক বেশি দাম দিয়ে তিনদিনের কাগজ কিনে হোটেলে ফিরে দেখে কূর্মলিঙ্গম কফি পান করছেন।

কই, বণ্ডা আ... নি ?...

পেয়েছো? আমি বললাম তোমাকে। বেরিগুড! দেখো, আমার আর একটা ছুটো কাজ করাবার আছে, আই

হোপ ইউ ওণ্ট মাইণ্ড। আচ্ছা, আজ রাতে কি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি?

না, জবাব দেয় প্রবাল। আজ তো বলা নেই। কাল রাতে অ্যারেঞ্জ করা যেতে পারে। আজকে আমার একটু কাজও আছে। —আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না ওর।

আরে, তোমার কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তুমি আমার আর দু-একটা কাজ করে দিয়ে যাও। আশা করি তোমার 'বস্'-এর জন্যে এটুকু তুমি করবে। আ'ল সার্টেনলি রিমেম্বার ইউ। তোমার ফিউচার ব্রাইট।—মৃদু হাসলেন কূর্মলিঙ্গম। এই প্রথম ওঁর হাসি দেখলো প্রবাল।

দেখো, ক্যালকাটায় এখনও একটা-দুটো জিনিসের স্থবিধে আছে। রসগোল্লা, থ্যাঙ্ক গড, এখনও একেবারে উঠে যায়নি। ড্রিংকস এখনও সহজলভ্য। অ্যাণ্ড, আই তিংক, বেঙ্গলি গার্লস্ টু। —সাদা দাঁত দেখালেন কূর্মলিঙ্গম।

চৌধ্রি, তুমি কি টিটোট্যালার?

হ্যাঁ। ভীষণ গম্ভীর হয়ে বলে প্রবাল।

বেশ তো, আজকে আমার অনারে একটু পান করে দেখো না।

আ'ম সররি। —দাঁতে দাঁত চেপে বলে প্রবাল।

আচ্ছা, আচ্ছা। দরকার নেই। তুমি আমাব জন্যে একবোতল হুইস্কি এনে দাও তো, প্লীজ। ভালো, অথচ শস্তা। আর ঐ সঙ্গে কোনো সাউথ ইণ্ডিয়ান দোকানের বণ্ডা।

এতো সহজ করে এতো কঠিন আদেশ করতে পারেন কূর্মলিঙ্গম। কী করবে—মনে মনে ভাবলো। পিসেমশাইকে স্মরণ করলো মনে মনে। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললো—হোটেলের বয়েরা এগুলো ভালো পারে বোধহয়। আমি তো দোকানও ঠিক চিনিনে।

কী যে বলো! তোমাকে আনতে বলায় আমি দুঃখিত। কিন্তু এটুকু ফ্রেণ্ডশিপ তোমার সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই হয়েছে। বেয়ারা

দিয়ে কি এসব হয়? প্লীজ ডোণ্ট টেক ইট আদারওয়াইজ।—উঠে দাঁড়ালেন কূর্মলিঙ্গম। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন—প্লীজ হেল্প মি, চৌধ্রি। আবেদনের মতো শোনালো ওঁর গলা।

হায় রে চাকৃরি। সাধে কি লোক বলে গোলামি? একটু ইতস্তত করে নোটখানা নিয়ে আবার বেরুলো প্রবাল।

দোকান চিনতে অসুবিধে হলো না—এ পাড়ায় ও দোকান অসংখ্য। অসুবিধে হলো ঢুকতে গিয়ে। কান লাল হয়ে গিয়েছে, বুকের মধ্যে টিপটিপ, আর মনে হচ্ছে রাজ্যের যতো পরিচিত লোক সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। কিনতে গিয়ে হলো আরো অসুবিধে —না জানে নাম, না জানে দাম। কোনোরকমে একটা বেঁটে বোতল পনের টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে হন হন করে বেরিয়ে এলো, আর রাস্তায় কোনোদিকে না চেয়ে সোজা এসে উঠলো হোটেলে।

এনেছো? বাঃ বাঃ! বেরি গুড। দেয়ারস এ ডিয়ার। কই, বণ্ডা আনোনি?—প্রকৃত খুশি দেখায় মিঃ কূর্মলিঙ্গমকে।

পেলাম না।—নির্জলা মিথ্যে বলে প্রবাল।

যাহোক, দাও। বোসো, বোসো। ভয় পেও না। আজকের দিনের শিক্ষিত তরুণ—রিয়্যালি ইউ মেক মি লাফ! বোসো।

বসলো প্রবাল—অনেক দূরের একটা সোফায়।

কূর্মলিঙ্গম ইতিপূর্বেই প্যাণ্ট-শার্ট ছেড়ে লুঙ্গি-ফতুয়া পরে ফেলেছেন। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সুটকেস থেকে বার করলেন একখানা কম্বলের আসন, মেঝেয় সেখানা পেতে ফেললেন, ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এলেন দুটো সোডার বোতল, টেবিলের উপর থেকে একটা কাঁচের গেলাস। তারপর ওগুলো আর ঐ বেঁটে বোতলটা নিয়ে গিয়ে বসলেন আসনে। তারপর বোতল থেকে একটু রঙীন পানীয় ঢাললেন গেলাসে, মেশালেন তাতে সামান্য

সোডা। তারপর চোখ বন্ধ করে, হাতে পৈতে জড়িয়ে, সুর করে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে, পানীয়টি ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করে গেলাসটি মাথায় ঠেকিয়ে, ছোঁওয়ালেন ঠোঁটে। একটু থেমে একঢোক গিললেন। তারপর আরেক ঢোক। তারপর সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উঠে এলেন টেবিলে। গোটা অনুষ্ঠানটি প্রবাল দেখলো দুই চোখে শিশুর সারল্য ও কৌতূহল এবং অন্তরে ব্রাহ্ম-আচার্যের ঘৃণা নিয়ে।

টেবিলে বসে নিঃশব্দে আরো গোটাকতো বড়ো বড়ো চুমুক মেরে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন কূর্মলিঙ্গম। —কী, চৌধ্রি, চলবে নাকি একআধ সিপ?

জবাব দিল না প্রবাল। কূর্মলিঙ্গম হাসলেন।

অতি দ্রুত কয়েক গেলাস সোডা মিশ্রিত পানীয় সেবন করে মিঃ কূর্মলিঙ্গম প্রবালের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে চাইলেন। একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—নাউ চৌধ্রি, ইউ আর টেকিং মি সামহোয়্যার।

কোথায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, বলুন? দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললো প্রবাল।

জাহান্নমে।—জোরে হাসলেন কূর্মলিঙ্গম।

জায়গাটা কি খুব ভালো?—হাসলো না প্রবাল।

ভীষণ ভালো। চলো, চলো এখন আমাকে নিয়ে তোমাদের সেই বিখ্যাত জায়গায়। কী যেন নাম? সোনা, সোনা—সোনা সামথিং? যেখানে কলকাতার একমাত্র ভাল জিনিস পাওয়া যায়?

হোয়াট ডু ইউ মীন?—নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলো প্রবাল। এ্যাম আই-এ পিম্প?—কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছে না।

চটছো কেন হে। সাবর্ডিনেট হয়ে একটু পিমপিং করলেই না হয়। চোখ দুটো ঘোর লাল কূর্মলিঙ্গমের।

এ কথার জবাব কথা দিয়ে হয় না। চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখছে প্রবাল। পিসেমশাইয়ের চেহারাও ঝাপসা। অতি দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পেছন থেকে শুনতে পায় কূর্মলিঙ্গমের ডাক—চৌধ্রি, শোনো। শোনো। চৌধ্রি, ডোণ্ট বি এ ফুল! চৌধ্রি —চৌধ্রি—

রাস্তায় বেরিয়ে থুথু ফেললো প্রবাল—বদ্ গন্ধটা নাকে এখনও লেগে রয়েছে। তারপর সটান চলে গেলো পিসেমশাইয়ের বাড়ি। উনি ফেরেন নি তখনও। বাড়ি গেলো। গিয়ে চান করলো অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিন সোজা আপিসে গেলো প্রবাল, কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর টেলিফোন করলো চার্লটন হোটেলে।

মিঃ কূর্মলিঙ্গম্ হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আজ ভোরবেলা। বেশি খবর জানতে হলে আসতে হবে হোটেলে। বললো হোটেল থেকে।

বলে কী? এ্যাঁ!

হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো প্রবাল।

ও, কূর্মলিঙ্গম? তাকে বাধ্য করা হয়েছিলো হোটেল ছেড়ে দিতে। হি বিকেম বয়স্টারাস আনডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব লিকর। চিৎকার করে বলে তাকে কোনো হাউস অব ইল-ফেমে নিয়ে যেতে। অনেক বোর্ডার আপত্তি জানান। সবাইকে যা তা বলে ও। আজ সকাল হতেই তাই ট্যাক্সি ডেকে ওকে বার করে দেওয়া হয়েছে। জানি না কোথায় গেছে।

টাকা-পয়সা দিয়ে গেছে তো? জিজ্ঞেস করে প্রবাল।

হ্যাঁ, ও আমরা আদায় করে নিয়েছি।

টেম্প্ল চেম্বারে গিয়ে দেখা করলো প্রবাল পিসেমশাইয়ের সঙ্গে। সব কথা খোলাখুলি বললো তাঁকে। দাঁড়া এক্ষুণি চিঠি লিখছি ভূতযোনিকে।—বললেন পিসেমশাই।

নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে দিন দশেক আপিস করবার পরে এলো সেই প্রত্যাশিত চিঠি। কূর্মাণ্ড প্রকল্পের কলকাতা আপিস তুলে দেওয়া হচ্ছে উইথ ইমিজেট এফেক্ট। প্রবালের চাকরি খতম। টাইপিস্ট, বেয়ারা পুরোনো আপিসে ফিরে যাবে।

চিঠি পড়া শেষ হতেই প্রবালের কানে ভেসে এলো পূর্ণর গলা। পূর্ণ বলছে সিতাংশুকে—কাউডা হালাগো কামড় জানেন নি? উঃফ্। দাতে যা ধাব—

মেচেদায় এসে মেলগাড়ি আটক রইলো। খড়গপুর থেকেই শুরু হয়েছিল তিনটে জিনিস : হৈ চৈ, নোংরা কথা আর গাড়ি থামানো। মেচেদায় এসে তা চরমে উঠলো।

চালের অভাবে বিক্ষোভ। খাদ্যাভাব মানুষকে হন্যে করে তুলেছে। কিন্তু, রেলগাড়ি বন্ধ করে, প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধেয়

ফেলে, কি তার সুরাহা হবে? আবার, অন্য কী ভাবেই বা বিক্ষোভ জানাবে মফঃস্বলের সাধারণ লোক! ঠিক ভেবে পায় না প্রশান্ত।

দুরাত গাড়িতে কাটিয়ে দেহ-মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কোথায় সকালবেলা হাওড়া পৌঁছে, স্টাফ কারে করে সোজা গেস্ট হাউসে যাবে, আর ভালো করে চান করে, পেট পুরে খেয়ে একটি পরিপাটি ঘুম লাগাবে, তা না এতোটা বেলা অবধি এই মেচেদায়। এবং নমুনা দেখে মনে হচ্ছে হয়তো এ অপেক্ষা অনন্তকালের!

বার কয়েক বিচ্ছিরি চা, গরম সিঙ্গাড়া, ঠাণ্ডা ডাব, জর্দা-পান, সব খাওয়া হয়ে গেছে। যতোগুলো কাগজ পাওয়া গেছে সব কিনে পড়াও হয়ে গেছে। আর কী করা যেতে পারে। হতো ও থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, সঙ্গে থাকতো একটা দল, তাস খেলে কি হৈ হৈ করে হয়তো কাটিয়ে দেওয়া যেতো সময়। তাও যেতো কি? দু'রাত গাড়িতে—চান, খাওয়া, ঘুম, কোনোটাই ভালো হয়নি।

ক্যাপে পেয়েছিলো—আপিস থেকেই বন্দোবস্ত করেছিলো। মাদ্রাজ থেকেই যাঁকে সহযাত্রী পেয়েছিলো—মাঝবয়েসী তেলুগু ভদ্রলোক—তিনি ওয়ালটেয়রে নেমে গেলেন। তেলুগু ভদ্রলোক খুব কথা বলছিলেন—প্রয়োজনের অনেক বেশি। এবং তাঁর প্রধান প্রয়াস হয়েছিলো তেলুগু ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশান্তকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওযা। তেলুগু বর্ণমালা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ; তেলুগু ভাষাকে নিঃসন্দেহে ফ্রেঞ্চ অব দ্য ঈস্ট বলা চলে। প্রশান্ত পরিষ্কার বুঝছিলো ও বাঙালি বলেই ওকে বোঝানোর অতো আগ্রহ ভদ্রলোকের। দক্ষিণ ভারতে তো আর কমদিন কাটিয়ে এলো না। তবু, সঙ্গী হিসেবে মন্দ ছিলেন না ভদ্রলোক। কিন্তু, তাঁর জায়গায় ওয়ালটেয়র থেকে যিনি উঠলেন তিনি এক তামিল বৃদ্ধ—রিটায়ার্ড অফিসর, কলকাতায় বড়ো চাকুরে ছেলের কাছে চলেছেন। তিনি প্রায়-নির্বাক—সর্বক্ষণ ডুবে রয়েছেন উত্তরক্ষের

তন্ত্রের বইয়ের মধ্যে। গাড়ি আটকে থাকায়, মনে হচ্ছে, তাঁর কোনো প্রবলেম নেই।

নাঃ! আর পারা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো প্রশান্ত। গাড়ির বেশির ভাগ লোকই প্ল্যাটফর্মে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। আর তাদের মাঝখানে শতেক ফেরিওলা—তাদের তারস্বরে চিৎকার বন্ধ হবার নয়। শ্রাবণ মাসের এই দিনটা যেন ওদের পৌষমাস।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করা দুঃসাধ্য। লোক আর লোক, স্ত্রীলোকও কম নয়। হৈ হৈ আর হট্টগোল। ঝগড়া আর ট্রানজিসটরের আওয়াজ। এক জায়গায় তো বিরাট ঝামেলা। কী ব্যাপার? না, দুটি তরুণীকে নানান ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলছিল তাদের সঙ্গীরা। একটা ছোটখাটো ভিড় জমে যায়। সেই ফাঁকে কে একজন মেয়েদুটোর ছবি তোলবার চেষ্টা করলে তা মেয়েদের তরুণ অভিভাবকদের নজরে পড়ে।—হুঙ্কার শুনে আর এগোয় না প্রশান্ত।

ওখানে আবার হাতাহাতি কেন? পরিষ্কার দুটি দল। অনেক চেষ্টায় ব্যাপারটা জানা গেল। দেশে চাল আছে কি নেই—এই প্রশ্ন ছিল গোড়ায়। এখন কংগ্রেস—যুক্তফ্রন্ট ছাড়িয়ে, মাওৎসে তুন্—নক্‌সালবাড়ি পেরিয়ে, একেবারে বোন, বৌয়ের ভাই, ইত্যাদিতে চলে এসেছে। এবং সেই আত্মীয়তার সুবাদে কিঞ্চিৎ আলিঙ্গন, মর্দন, ইত্যাদি।

না, ভালো লাগছে না। খড়্গপুর থেকেই ব্যাপারটা সুবিধে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত চোখ বলেই কি, না সমস্ত ব্যাপারগুলোই নিতান্ত সাময়িক? বাইরে থাকতে কিছু কিছু পড়েছে কাগজে, শুনেছেও লোকমুখে বিস্তর। আর, এ-সব জিনিস আজকাল অল্পবিস্তর সব জায়গায়, সব প্রান্তেই মাথা চাড়া দিয়েছে। অমন যে-শান্ত অঞ্চল দক্ষিণ ভারত, তাও তো অশান্ত আজকাল। বাংলাদেশের উদ্বেলতা তো চিরকালের।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের নির্জনতম প্রান্তে চলে গেল প্রশান্ত। হঠাৎ নজর পড়লো একটা নাম-না-জানা অদ্ভুত গাছের উপরে। মূল কাণ্ডটা ভাঙ্গা, কিন্তু একটা ডাল কেমন সতেজ। তার সবুজ বৃষ্টি-ধোওয়া পাতার উপরে সূর্যকিরণ পড়ে কেমন শ্যাম-রশ্মি বিকিরণ করছে। বহুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো প্রশান্ত।

ঘড়ি দেখলো—নটা বাজতে চললো। কখন যে গাড়ি ছাড়বে, আর কখন গিয়ে পৌঁছবে কলকাতায়! কতোকাল বাদে আবার সেই কলকাতা। বেশিদিন তো তার উপর অভিমান করে থাকা গেল না!···পায়ে পায়ে ফিরতে লাগলো প্রশান্ত। বাঃ! একি! আর তো হাতাহাতি নেই। দলটা রয়েছে—সবাই হাসছে, মস্করা করছে, সিগরেট ফুঁকছে। বেশ গলাগলি ভাব। মনে মনে হাসলো ও। আর একটু এগুতেই কানে এলো গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত। ও মা! এ যে সেই ছবিতোলার দলের ছেলেমেয়েরা। চুরি করে ছবিতোলার অপরাধে যার হাতে মাথা কাটছিল সবাই, সে-ই গান গাইছে—গলায় ঝুলছে ক্যামেরা; তাকে ঘিরে অনেক তরুণ-তরুণী। হ্যাঁ, সেই মেয়েদুটোও রয়েছে একেবারে গায়কের গা ঘেঁসে বসে। এক মুহূর্তে মনটা চাঙ্গা হয়ে গেল। এই তো বাংলাদেশ! একটু দূরে দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো ও। তারপর ফিরলো নিজের ক্যুপেতে। কাছেই ক্যুপেখানা—শুয়ে শুয়েই গান শোনা যাক।

শার্ট খুলে ফেলে শুধু গেঞ্জি গায়ে শুয়ে পড়লো। ছেলেটি নতুন গান ধরেছে: মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ···।

প্রশান্ত হাসলো মনে মনে। সেও কি অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এলো? পনের বছর দেশছাড়া—হ্যাঁ, পুরো পনেরটা বছর। বিশ বছর আগে যে পৈতৃক ভিটে ছেড়ে কলকাতায় বাসা বেঁধেছিল, সেটা আর ততো ব্যথা জাগায় না মনে। কিন্তু, গতো পনের বছর —ওর পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়েস: জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—ও

রেখে এলো বিদেশে। হ্যাঁ, বিদেশ ছাড়া আর কী? এক বছর এলাহাবাদ, দুবছর দিল্লি, তিন বছর বম্বে, চার বছর হায়দরাবাদ, আর বাকি বছরগুলো মাদ্রাজে। যে-কলকাতা থেকে একদিন প্রায় বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো, এবং গতো পনের বছরে যে বাংলা-দেশে একদিনের জন্যেও ফিরতে ইচ্ছে করেনি, হঠাৎ কিছুদিন হলো সেখানে ফিরবার জন্যে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছিলো। এবং এই যে এখন কলকাতা পৌঁছতে দেরি হচ্ছে এর জন্যে মনে বড়োই জ্বালা ধরছে। কলকাতা যেন ওর কাছে এখন অপেক্ষমানা প্রোষিতভর্তৃকা।

আত্মীয়-বন্ধু-সমাকীর্ণ এই শহর একদিন কী বিচ্ছিরি মনে হয়েছিলো ওর। পার্টিশানের পরে সেই সব কষ্টের দিনগুলো। সামান্য চাকরি—উন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ। এক এক করে মা মারা গেলেন, ভাইয়েরা চাকবি-বাকরি পেয়ে সব যে যার জায়গায় চলে গেলো। বন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে, আত্মীয়েরা ব্যাপৃত হলো তাদের দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে। একসময়ের এই প্রিয় শহর—ওর জন্মভূমি—ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। সুযোগও জুটলো একটা—ওদের কম্প্যানি এলাহাবাদে নতুন আপিস খুললো আর কিছু বেশি মাইনেতে ও চলে গেলো সেখানে. বছর খানেক বাদে প্রমোশন পেয়ে দিল্লি আপিসে। এলাহাবাদ দিল্লি ভালো লাগেনি ওর। তদ্‌বির করে চলে গেলো বম্বেতে। সেখানকার নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ ওর একদম ভালো লাগেনি। তবু, বাংলাদেশে ফিরে আসতে চায়নি। তারপর আবার প্রমোশন, এবং দক্ষিণ ভারত। সর্বশেষে মাদ্রাজে বেশ কাটছিলো। সাধারণতঃ উত্তর ভারতীয়ের কাছে দক্ষিণ খুব সুখকর নয়, তবুও কিন্তু বেশ মানিয়ে নিয়েছিলো। তাছাড়া, একা মানুষ, আয় ভালো, পদমর্যাদা ছিলো, ছিলো অনেক অনুগত লোক। কিন্তু, ইদানীং সব কেমন যেন হয়ে গেলো। কী আশ্চর্য, কেবল দেশের নাম নয়, লোকে নিজের

পৈতৃক নামও পাল্টাতে সুরু করেছে। সংস্কৃত ওদের কাছে এখন 'উত্তরের ভাষা', 'নমস্কারম্' আর বলা চলবে না, বলতে হবে 'ভণক্কাম্'। অদক্ষিনীরা এখন শুধু 'উত্তরের লোক'। প্রশান্ত নিজেকে পূর্ব-ভারতের লোক বলায় একজন তো স্পষ্টই বললো পূর্ব-ভারতীয়েরা আরো ওঁচা—উত্তরের গোলাম। বহুদিন থেকেই ঠারে-ঠোরে আভাষে-ইঙ্গিতে ওরা সবাই জানাচ্ছিল—বাপু, আর কেন, কেটে পড়ো এবারে। একদিন তো বড়ো সায়েবই ইঙ্গিত করলেন। তখন থেকেই চেষ্টা চালালো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন—একটা প্রোমোশন এবং সেই সঙ্গে ট্রান্‌সফার কলকাতায়।

কলকাতা থেকে ওদের হেড অফিস বম্বেতে স্থানান্তরিত হলেও কলকাতায় বড়ো আঞ্চলিক আপিস ও গোটা তিনেক শাখা আপিস রয়েছে। এক শাখা আপিসের অফিসর-ইন-চার্জ হয়ে আসছে ও। এক কালে ত্যাগ করে যাওয়া শহর ও দেশ—গন্ধাশহর কলকাতা ও খণ্ড-ছিন্ন—বিক্ষিপ্ত, অশান্ত-উদ্‌ব্যস্ত পশ্চিমবঙ্গই দেখা গেল গৌড়জনের "সর্বতীর্থসার"। আর যাই হোক, এখানে কেউ তো বলবে না—হোয়াই ডোণ্ট্ গেট এ ট্রান্‌স্‌ফার ; কেউ তো নমস্কারের বদলে বলবে না ভণক্কাম্, কেউ তো বলতে সাহস করবে না 'উত্তরের গোলাম।'

সমবেত কণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকার, উলুধ্বনি, এবং বেশ কিছু সরব নোংরা কথার দমকে চমকে উঠলো প্রশান্ত। ধড়মড় করে উঠে বসলো। ব্যাপার কী? ও, গাড়ি ছাড়লো এবারে! পাঠনিরত বৃদ্ধ সহযাত্রীর মুখভঙ্গী দেখে মনে পড়লো বহুকাল আগের দেখা আলিপুরের এক ক্রুদ্ধ শাখামৃগকে। ঘড়ি দেখলো, অনেক বেলা —দশটা বেজে গেছে। স্টাফ কার থাকবে কি হাওড়ায়? গেষ্ট হাউসে খাবার জুটবে কি?

রামরাজাতলায় এসে ট্রেন আবার দাঁড়ালো।

"অ্যানাদার হোল্‌ড আপ! রিয়্যালি দিস ইজ 'আওয়ার'

ব্লেসেড বেঙ্গল!"—বৃদ্ধ সহযাত্রীর মুখভঙ্গী আবার সেই শাখামৃগের মতো। এ- ধরণের কথা শোনায় অভ্যস্ত প্রশান্ত, প্রতিবাদহীন প্রশান্ত, এখন মুখর হলো। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো "ফর টু লং হ্যাভ আই সীন ইয়োর ব্লেসেড তামিল নাড়ু। এণ্ড ফাউণ্ড ইট নো বেটার।" জাতীয় সংহতির প্রশ্নটি যে মনে পড়ছিলো না তা নয়। কিন্তু, তামিল নাড়ু, ওর ধারণা, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেই। আর কলকাতার সান্নিধ্য ওকে এক ধরণের লোক্যাল পেট্রিয়টিজমে অনুপ্রাণিত করলো।

হাওড়ায় গাড়ি পৌঁছলো বেলা বারোটায়। নিঃশব্দে নেমে গেলেন সহযাত্রী। আস্তে আস্তে গোটা গাড়ি, সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলো। না, প্রশান্তকে নিতে কেউ আসেনি। এলে রিজার্ভেশন স্লিপ তার নজরে পড়তোই।

মনে পড়লো·· আলিপুরের এক ক্রুদ্ধ শাখামৃগকে।

অগত্যা কুলি ডেকে মাল নামালো ও। একটা বই-ভর্তি পোর্টম্যান্টো, একটা ট্রাঙ্ক-ভর্তি জামাকাপড়, একটা বড়ো সুটকেস, একটা হোল্‌ড অল, একটা টুকিটাকি জিনিস-ভর্তি বাসকেট, আর হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ আর বাসি কাগজ, জর্ণাল, ইত্যাদি। মাদ্রাজে রোগা রোগা দুটো কুলিতে যা তুলেছিলো, হাওড়ায় তা

নামাতে দরকার হলো চারটে জোয়ান বিহারী কুলির। প্ল্যাটফর্মে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে গেট পেরিয়ে এলো ও। না, কেউ এসে ওর খোঁজ করলো না। ট্যাক্‌সি স্ট্যাণ্ডে দেখে তখনও বিরাট লাইন। অতএব, আবার অপেক্ষা।

কিন্তু, অবাক কাণ্ড, স্বয়ং আঞ্চলিক প্রধান চিঠি লিখেছেন : স্টাফ কার থাকবে স্টেশনে, আপিসের লোকও থাকবে।···কিছুই নেই। তবে, হ্যাঁ, হতে পারে, তারা একবার এসে ফিরে গেছে। এবং পরে আসতে গিয়ে আটকে পড়েছে। কলকাতার যা ট্র্যাফিক জ্যাম!

অগত্যা ট্যাকসিই নিতে হলো। ভাগ্যিস গেস্ট হাউসের ঠিকানা জানা ছিলো। চারটে কুলির মাথায় মাল দেখে ট্যাকসিওলা যেতে নারাজ। "অতো মাল! দুখানা ট্যাকসি নিন, মোসাই।" সিগরেটে আয়েস করে টানদিলো ছোকরা ড্রাইভার।

"কেন, এ মাল ধরবে না হোল্‌ডে—ভেতরে? লোক যে আমি একা।" মৃদু হেসে বলে প্রশান্ত।

"সর্দারজীর ট্যাকসিতে যান তাহলে। আমাদের গাড়ির জান অতো শক্ত নয়।" গম্ভীর চালে বললো ছোকরা; তারপর দোসরা প্যাসেঞ্জার তুলে নিলো।

পর পর তিনখানা ট্যাকসি ছেড়ে, চতুর্থখানা—হ্যাঁ, সর্দারজীরই—ওকে দয়া করলো। শুধু বললো মালের জন্য কিছু বেশি পয়সা দিতে।

হাওড়া স্টেশনে নেমে মনটা আবার মুষড়ে পড়েছিলো। হাওড়া ব্রীজের উপরে উঠে তা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আহ্! কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া। আবার সেই কলকাতা। সেই বাংলা দেশ। সেই মিষ্টি কথা, সেই রসগোল্লা-সন্দেশ-পানতুয়া, সেই মাছের ঝোল-ভাত, সেই সুক্তো-চচ্চড়ি-ঘণ্ট-ডাল-ডালনা-অম্বল-দই। ইডলি-দোসাই-বড়া নয়, উপ্‌মা-পঙ্গাল-পায়সম্ নয়, পুরি-পকৌড়ি-ভেলপুরি নয়।

উঃ! কী লোকই বেড়েছে কলকাতায়, আর কী নোংরাই হয়েছে শহরটা! হাওড়া স্টেশন, স্ট্র্যাণ্ড রোড, ইডেন গার্ডেনের আশপাশ—ট্যাকসি থেকেই সব দেখা গেল। কিন্তু ময়দানে পড়তেই আহ্! চোখ জুড়িয়ে গেল। শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা! চতুর্দিকে সবুজের শ্যাম সমারোহ, নতুন নতুন টুকরো বাগান সব। আরে, চৌরঙ্গীর স্কাইলাইন দেখছি একদম বদলে গেছে। কতো নতুন স্কাইস্ক্রেপার। ঐ তো সেই গান্ধীজীর স্ট্যাচু—এতোদিন ছবিতেই দেখেছিলো। এই সেই পুরোনো পার্ক ষ্ট্রীট। ঐ সেই বিখ্যাত বাড়ি, ওদের কম্প্যানি কিনে নিয়েছে; ওরই মধ্যে করেছে গেস্ট হাউস।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নেমে সমস্যা—মালগুলো নামায় কে, আর ঐ বিশাল বাড়ির কোন প্রান্তে ওদের গেস্ট হাউস? একটু দূরে টুলে বসা লিফটম্যানকে দেখলো; ইশারায় ডাকলো তাকে। সে ভ্রুক্ষেপ করলো না। আশপাশে দ্বিতীয় কোনো লোক নেই। কিছুক্ষণ অবস্থাটা দেখলো ড্রাইভার। তারপর 'আ তেরি ...,জাতীয় কী একটা বলে নিজেই মাল নামাতে লাগলো। ওকে অনেক পয়সা বেশি দিল প্রশান্ত।

মাল তো নামানো হলো, এখন করে কী? কতোক্ষণ আর এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। কতো বেলা হয়েছে, ওদের পেট চোঁ চোঁ করছে! মাল পড়ে রইলো, প্রশান্ত এগিয়ে গেল লিফটম্যানের কাছে।

লিফটম্যান তখন খৈনি তৈরী করতে ব্যস্ত। প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো কেয়ারটেকার কোথায় থাকে। লিফটম্যান বার চারেক জোরে জোরে তালি বাজালো, তারপর সবটা খৈনি মুখে পুরে, হাত ঝেড়ে, সাঁ করে গিয়ে ঢুকলো লিফটের মধ্যে। কড়া সেন্টের গন্ধে পিছনে তাকায় প্রশান্ত। দেখে তিনটি মহিলা ঢুকছে গিয়ে লিফটে —একজনের পরনের শাড়ি-চোলি খসে পড়তে উন্মুখ, আর এক-জনের পরনে মিনিস্কার্ট, আর তৃতীয় জনের পরনে, সেই যে বিখ্যাত

প্রাবন্ধিক বলেছেন, "যবনী বারাঙ্গনার" পোষাক। লিফট উপরে উঠলো।

অনেকক্ষণ বাদে নামলো লিফট। লিফটম্যান বেরিয়ে এসে, বার দুয়েক থুথু ফেলে, ভুরু কুঁচকে চাইলো ওর দিকে। এবং ওর প্রশ্নের জবাবে বাঁ হাত দিয়ে দেখালো আউট হাউস, যেখানে কেয়ারটেকারের আস্তানা।

ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে—মাল সব পড়েই রইলো—প্রশান্ত গেলো কেয়ারটেকারের দরজায়। বার কতো বেল টেপায় দরজা খুললো না, কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো—কোন শালা আবার এলো এখন! সেই শালা নয়তো যার আজ মাদ্রাজ মেলে আসার কথা ছিল। ড্রাইভারের কথায় ধরে নিয়েছিলাম গাড়ি আজ পৌঁছচ্চে না। এসে গেলো নাকি। দেখি—।

"কী চাই?" বাইরে এসে ইংরাজীতে জোর গলায় প্রশ্ন করে কেয়ারটেকার।

চেহারায় লালন-ললিত-যত্ন, পোষাক দেখে মনে হয় দু হাজারী অফিসর।

"আপনাকে চাই!" মিষ্টি করে বাংলায় বলে প্রশান্ত। "আমার নাম প্রশান্ত মজুমদার। মাদ্রাজ থেকে আসছি আপনাদের এখানকার ব্রেবোর্ণ রোড আপিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসর হয়ে। আমার থাকবার ব্যবস্থা তো গেস্ট হাউসে হয়েছে আপাতত। সে-ব্যবস্থাটা করে দিলে খুশি হতাম।"

"ও।" কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না লোকটা। "দাঁড়ান, আমি চাবি নিয়ে আসি।"

কেয়ারটেকার এলো, কুলি-টুলি ডেকে মালও তোলালো, ঘর খুলে দিলো—ছোটো প্রায়-অন্ধকার ঘরখানা। আলোহাওয়াওলা দুর্দান্ত রকমের সাজানো বড়ো ঘরখানা বললো কার জন্যে যেন রিজার্ভড। দারোয়ানকেও ডেকে আনলো। সমস্ত কাজই সে করলো

মুখে বিরক্তি আর কথায় অসহিষ্ণু ভাব নিয়ে। কথার ছলে জানাতে ভুললো না সে স্থানীয় বড়ো কর্তার আত্মীয় আর হেড অপিসের সর্বময় কর্তার খাশ পেয়ারের লোক। দরকার-টরকার যা দাবোয়ানকে বলতে বলে চলে গেলো ও।

আগে দরকার চান। তারপরে কিছু খাওয়া।

অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারে চান করলো প্রশান্ত। বেরিয়ে এসে হালকা পোষাক পরে ডাকলো দারোয়ানকে। জিজ্ঞাস করলো খাবার কী ব্যবস্থা আছে।

কোনো ব্যবস্থা নেই। দাঁত বার করে বললো দারোয়ান।

কেন? এখানে যাঁরা থাকেন তাঁবা কী করেন তাহলে?

তাঁরা বাইরে খান।

কিচেনে কী হয় তাহলে?

কাফি-উফি হয়।

কে বানায়, তুমি?

হুঁ।

এখন বানাতে পারবে?

না।

কেন?

কাফি পাউডর নাই, শককর নাই, দূধ ভী নাই।

বাঃ!

ঘড়ি দেখলো প্রশান্ত—পৌনে তিনটে। কলকাতা পৌঁছনো গেলো, গেস্ট হাউস পাওয়া গেলো। চানও হ'লো। এখন খাওয়ার কী করে? ভেবেছিলো খেয়েদেয়ে, লম্বা ঘুম দিয়ে, সেই সন্ধ্যেবেলা একেবারে বেরুবে; চৌরঙ্গী-পার্কস্ট্রীট ঘুরে বেড়িয়ে, কোনো হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে ফিরবে। সামান্য একটু পানও করা যাবে নাহয়। পান-প্রীতি নেই ওর খুব, তবে মাঝে মাঝে ভালো খাবারের আগে একটু বিয়ার, কি লাইম জিন, কি গোটা দুই ছোটা

হুইস্কি—মন্দ নয়। কলকাতাই দেশের মধ্যে একমাত্র শহর যেখানে পানীয়ের স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া, আরেকটি ব্যাপারও আছে। প্রশান্ত শুনেছে কলকাতা শহরে জীবন দেখতে গেলে আজ-কাল আর চায়ের দোকানে গেলে চলে না—যেতে হয় বার-কম-রেস্তোরাঁয়। চাকুরে হলে কী হবে, প্রশান্ত সাহিত্যরসিক, জীবন-রসিক। চল্লিশোর্ধে ও কিছু সাহিত্যকর্ম করবে ঠিক করে রেখেছে। চল্লিশ তো হলোও। নিশ্চিন্ত একটা চাকরি—বারো-তেরোশো টাকা নেহাৎ কম কী একজনের পক্ষে আজকালকার বাজারেও? নির্ঝঞ্ঝাট জীবন: সাহিত্যকর্মের পক্ষে এমন প্রশস্ত সময় আর কজনের আছে? পয়সার প্রয়োজন নেই ওর তেমন, খ্যাতিরও ততোটা নয়। আসলে ও কিছু করতে চায়, কিছু দিয়ে যেতে চায় সংসারকে। আর বিয়ে যখন করেনি, এবং করবেও না ঠিক করেছে, তখন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো, নাহলে যে নিউরোসিসের আক্রমণ এড়াতে পারবে না। সব দিক থেকেই সুবিধে হলো কলকাতায় ফিরে এসে। বাইরে থেকে তো দেখে এলো—কোনো কিছুরই সুবিধে হয় না। যতো অশান্তি—উপদ্রবই থাক, বাংলাদেশ, কলকাতা শহর, ছাড়া আর গৃহ কোথায় গৌড় সন্তানের? স্বধর্মে নিধনও ভালো। কলকাতার নমুনা খুব ভালো ঠেকছে না, তবু চিত্ত ভরাতে এখানেই শ্রেয়। "তাই মা তোমার কোলে এসেছি আবার।" দেবেন সেনের কবিতা আবার মনে পড়লো। এবং মনে মনে, ওর সঙ্গে মিল করে, আরেকটি লাইন যোগ করলো—প্রশ্নই ওঠে না কোনো ফিরিয়া যাবার।

কিন্তু, মনকে নিয়ে আর ব্যাপৃত থাকা চললো না। পেটকে শান্ত করতে হবে। উঠে পড়লো প্রশান্ত। পরনে ট্রাউজার্স-বুশশার্ট, পায়ে চপ্পল, পকেটে পার্সভর্তি টাকা—দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। খেতে হবে, সবচেয়ে কাছের দোকানে, যা কিছু হয়।

বার চারেক বেল টেপায়ও যখন লিফ্‌ট এলোনা, তখন সিঁড়ি দিয়েই নামতে হলো। বাব্বা! দোতলা হলে কী হবে—আগেকার দিনের ম্যানসন, একতলা তিনতলার সমান। লিফ্‌টের গোড়ায় দেখলো লিফটম্যান—দারোয়ানের নিভৃত আলাপ। ওকে দেখে ওরা কোনো প্রকার সম্মান দেখালো না। আহত বোধ করলো ও। মাদ্রাজে কিন্তু সেলাম, নমস্কারমে (থুড়ি, ভণক্কামে) অস্থির হয়ে যেতে হতো।

গেট দিয়ে বেরিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে পড়তেই দেখে ওপারের ফুটপাতে সব ঝকঝকে দোকান। তারমধ্যে একটিকে রেস্তোরাঁই মনে হচ্ছে। নামটিও বেশ—ওলিম্পাস। কলকাতা শুধু কল্লোলিনী নয়, কলকাতা কল্পনাপ্রবনা-ও। মুচকি হাসলো প্রশান্ত।

এয়ার কণ্ডিশন্‌ড চমৎকার জায়গাটি। ও হরি! ইটিও বার-কম-রেস্তোরাঁ। কাউন্টারে রং বেরংয়ের শিশিবোতল। ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা—ছোটো ছোটো টেবিলে চারখানা করে চেয়ার। এক-কোণে কয়েকটি সদ্য-গুম্ফোদ্ভূত কিশোর ও তাদের দুই সহচরীকে আবিষ্কার করে পুলকিত হলো ও। হ্যাঁ, তাদের টেবিলেও পানীয় এবং তার সঙ্গে কিছু বই খাতা। জীবনরসিক প্রশান্ত ওদের কাছা-কাছি আরেকটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসলো। এই নতুন জেনা-রেশনের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আর আজ প্রথম দিনেই এমন সুযোগ!

কিন্তু ক্ষিদেটা মেটানো দরকার সবচেয়ে আগে।

ওয়েটর ছুটে এসে কার্ড বাড়িয়ে ধরলো। ওমা! এতো সব পানীয়ের নাম, খাবার কোথায়? খানেকো বাস্তেমে কেয়া মিলেগা? ওনলি স্ন্যাকস্? কাহে? ও, তিনটে বাজে। লাঞ্চ আওয়ার ওভার? খানা আবার সেই সাতটার পরে? কফিও পাওয়া যাবে না? চপ-কাটলেট-পকৌড়া-চিপস্ শুধু।

—বলিয়ে! ধৈর্যহীনতা ওয়েটরের গলায়।

ব্যাপারটা বোঝা হয়ে গেল প্রশান্তর। খাবার খায় তো কম পয়সার খদ্দেরে, টিপস্ দেয় তারা আরো কম। ঠিক হ্যায়! কলকাতায় প্রথম দিনটা একটু সেলিব্রেট করাই যাক। তবে, একা একা ঠিক জমবে কি? আপাতত অবিশ্যি পাশের টেবিলের ওরা রয়েছে। এক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার আর গোটা দুই কাটলেটের অর্ডার দিলো ও।

পোষাক এবং চেহারা দেখে মনে হয়েছিলো বহিরাগত, কিন্তু কথা শুনে বোঝা গেল ওরা স্থানীয়। ওদের ভাষায় অবিশ্যি ইংরেজী সত্তর পয়সা, বাংলা কুড়ি পয়সা, আর বাকি দশ পয়সা হিন্দি-ফ্রেঞ্চ জার্মান-রাশ্যান। দেশটা কী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দেখো। দিবা দ্বিপ্রহরে কলকাতা শহরে কিশোর কিশোরীরা বই খাতা হাতে নিয়ে মদ্যপান করতে করতে বিভিন্ন ভাষায় কতো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছে। টুকরো টুকরো কথার অনেক কিছুরই মানে বোধগম্য হলো না প্রশান্তর। কিন্তু, পপ্ মিউজিক, নিও-এক্সপ্রেশনইজম্, হিপ্পি, কাফকা, মোরাভিয়া, বীটলস্ এল-এস-ডি, ম্যুভাল ভাগ, ইত্যাদি পরিচিত শব্দ শুনতে লাগলো ও বিয়ার-কাটলেট খেতে খেতে।

বিয়ার কাটলেট শেষ করে ওয়েটরকে ডাকলো ও। এরই মধ্যে বয়টা ওকে সমীহ করতে শুরু করেছে। পার্স বার করে তা থেকে একখানা একশোটাকার নোট দিয়ে প্রশান্ত সিগরেট আনতে বললে, আর বললো একটা লাইম-জিন দিতে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো, আস্তে আস্তে লোক বাড়ছে। ঘড়িতে দেখলো চারটে বাজতে চলেছে।

পাশের টেবিলের আলোচনায় কর্ণপাত করলো ও। শুনলো উচ্চমার্গ ছেড়ে তা এখন নিম্নাঙ্গমুখী: আলোচনা এখন হেয়ার রিমুভারে কেন্দ্রীভূত। হঠাৎ একটি ছেলে চঞ্চল হলো। "এই, বাবা!" "কোথায়?" উদ্বেগের সঙ্গে বলে উঠলো অন্য দুটো ছেলে।

মেয়েদুটো কৌতুকের স্বরে বললো, "রিয়েলি?" ছেলেটি বললো

"ঐ তো, ঐ কোণের দরজা দিয়ে ঢুকে বাথরুমে গেল। লেট্স্ গেট আউট।" "হ্যাভ নার্ভস, অ্যারো।" বললো একটি মেয়ে। "নার্ভস আছে, পার্স নেই।" হেসে বললো অ্যারো, ওরফে অরবিন্দ। তারপর সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

লাইম-জিনে চুমুক দিতে দিতে কেমন অবাক হলো প্রশান্ত। ঠিক এরকম একটি ঘটনার জন্যে ও প্রস্তুত ছিলো না। যাক্‌গে, এখন প্রয়োজন সঙ্গীর—কথা বলতে ও কথা শুনতে ইচ্ছে করছে খুব। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো আবার। লোক বেড়েছে, ক্রমাগতই আসছে, চাপা টুকরো টুকরো নানান ভাষার কথা, চাপা নানান ধরণের হাসি, পানীয় ঢালার তরল রব, সোডার বোতল খোলা: ফট ফট শব্দ। গেলাস, পিরিচ, চামচের টুনঠান। রেসের বই দেখছে অনেকে, কেউ কেউ সচিত্র পত্রিকা দেখছে, কেউ বা হঠাৎ জোরে হেসে উঠলো। হঠাৎ অন্ধকারটা চেপে এলো। বাইরে বোধহয় বিষ্টি এলো। গেলাসের তলানিতে মনোযোগ দিয়ে দেখছে এমন সময় কানে এলো বিশুদ্ধ কলকেতিয়া ভাষায় পরুষ ভাষণ: ওহে চঞ্চলকুমার! আমাদের টেবিল আজ বেদখল; ঐ ভ্যাকো এক মক্কেল বসে আচে।

চোখ তুলে চাইলো প্রশান্ত। বার্ণিস করা কালো রংয়ের তেল-কুচকুচে লম্বাচুলো, শাদা গিলেকরা পাঞ্জাবী ধুতি, চকচকে পালিস করা জুতো, মাঝবয়সী স্থূলকায় একটি বঙ্গসন্তান আর তার সঙ্গে দুটি কমবয়সী তরুণ। তরুণদের একজনের পরণে সাদা ড্রিলের প্যাণ্ট, সস্তা নাইলন শার্ট, সস্তা গোলাপী টাই; তরুণতরটির ছুঁচলো প্যাণ্ট, ছুঁচলো মুখ, ছুঁচলো গোঁফ, ছুঁচলো চুল। গায়ে স্পোর্টস শার্ট। ওরা তিনজন, প্রশান্ত দেখে, ওর দিকেই চেয়ে রয়েছে। মক্কেল তাহলে ও।

"চলুন, পাশের টেবিলে বসি।" হেসে বলে টাই-পরা ছেলেটি।

"না, হে, সায়েব, ও আমার পয়া টেবিল।" গলার আওয়াজ

কিছুমাত্র খাটো করে না লোকটি। "ঐ কোণে বসলে মক্কেল ধরা সুবিধে। তাছাড়া ঘোড়ার টিপস্‌ই বলো আর অন্য খপরই বলো ওখেনে বসলেই ভালো প্যাই। ইসমাইল তো জানেই যে আমাদের টেবিল ওটা। আর অন্যদিন যা-ই হোক, শুককুরবারে আমরা "অলিম্পাসে" আসবোই। ভ্যালা ঝামেলারে বাপু!"

"ইসমা-লেরে এট্টা ঘাঁতা দিতে হইব।" বলে রুক্ষ চেহারার সর্ব কনিষ্ঠ ছোকরাটি। ছোকরার মুখে একটি সস্তা সিগরেট যা থেকে অতি বদ গন্ধ বেরুচ্ছে। ওরা এগিয়ে এসে প্রশান্তর পাশে দাঁড়ালো। ওয়েটর ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলো।

"কেয়া রে, ইসমা-ল, তুমলোক কাহে নেই সমস্‌তা? অঁা? মারেগা তুমকো এক ঝাপর। হামকা টেবিল কেয়া হুয়া?" ছোকরার পূর্ববঙ্গীয় হিন্দি শুনে হাসলো ইসমাইল। "বৈঠিয়ে না ইস টেবিলমে। তিনঠো সীট তো হ্যায়-ই। আইয়ে। সাব," প্রশান্তকে উদ্দেশ করে বলে, "ইনলোগোঁকো জেরা বৈঠনে দিজেয়েগা।"

প্রশান্ত রাজী। সঙ্গীই তো চাইছিল ও। এরা শুধু ওকে সঙ্গই দেবেনা, মনে হচ্ছে আরো কিছু দেবে। ওয়েটরকে আরেকটা লাইম-জিন দিতে বলে ও উঠে গেলো বাথরুমে। যাবার সময় ইঙ্গিতে ওদের বসবার অনুমতি দিয়ে গেলো।

ফিরে এসে দেখে ওরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, ওকে ঠেলে দিয়েছে এক কোণে। ওর পাশে বসেছে মাঝবয়েসীটি, ছোকরাদুটি ওদের সামনে। টাইধারীর সামনে গেলাসে রাম, ওদের দুজনের হুইস্কি। মুঠো মুঠো চানা খাচ্ছে ওরা সবাই।

"ম্যাকগাফিনের সালাটা বোধহয় চলেই গ্যাচে রে। ও-সালা আসে বারোটায় আর সাড়ে তিনটে নাগাদ চলে যায়। আমি তো রেডিই ছিলুন, আমার চঞ্চলকুমারও ঠিক ছিলো। দেরি করলে সাহেব। সাহেব আজ ডুবিয়েছে। আজকের খরচা সব তার।" শেষের দিকটা কেমন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেলো বাবুটি।

"আমি কী করবো, বলুন ? আমার সায়েবই আমাকে ডোবালে ! শালা রোজ চলে যায় তিনটের মধ্যে হাই ব্লাড প্রেশার বলে। আজ তিনটের পরে বললে দুখানা জরুরী চিঠি করে দিতে। কী আর করি ! চলেও যাচ্ছে ব্যাটা। তবে, একটা সুবিধে হলো-কালকে বারোটার পরেই কাটবো।" রামের গেলাসে চুমুক দিলো ও।

"আরাকটা সুবিধার কথা তো কইলেন না ? দেরী করনের জন্যই তো দেখা হইয়া গেল মুনসীর লগে। তার প্রোমোশনের পব এই প্রথম। কী কইলো মুনসী ? ছোটো ব্রিস্টল সাইর‍্যা এখানে

তিনমূর্তি ওর দিকেই চেয়ে রয়েছে।

আইব। ও-হালায় আইলে আর খরচার ভাবনা কী ! খ্যান, চাটার্জী-:বাবু, সিগারেট খ্যান।" ছুঁচলো ছোকরাকে আরো রুক্ষ দেখায়।

"ইউ আর টেকিং জিন, মিস্টার। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। খ্যাট ইজ লেডিজ ড্রিংক ! নট হ্যাবিচুয়েটেড ? ইউ আর এ নিউকামার হিয়ার ?" বড়ো বড়ো দাঁত বার করে চ্যাটার্জীবাবু। অন্তরঙ্গ হতে

চায় প্রশান্তর সঙ্গে। মজার ব্যাপার। ওকে ধরেই নিয়েছে অবাঙ্গালি!

"হুইস্কি নট বিফোর সানডাউন" মুচকি হেসে বলে প্রশান্ত। "নিউকামার, ইয়েস।"

"আই থট রাইট। ইউ সী, আই নো অলমোস্ট অল পিপল্ কামিং হিয়ার। এণ্ড আই নো অল সাচ প্লেসেস ইন ক্যালকাটা। ইউ আর এ নিউকামার টু ক্যালকাটা অলসো?" নিখুঁত বঙ্গীয় ইংরেজী প্রশান্ত দীর্ঘদিন বাদে শুনছে।

"ইয়েস, কেম টু ক্যালকাটা আফটার ফিফটিন ইয়ার্স।" মনে মনে ভাবলো এইবারেই বুঝি নাম-ধাম-মাইনে জিজ্ঞেস করে বসে। তাই গম্ভীর হয়ে একটু সরে বসে ওর গেলাসে নজর দিল।

"চ্যাটার্জীদা, ম্যাকগাফিনের শালা যদি না-ই আসে তাহলে চলুন "সম্বরে" যাই। ওখানে আসবে আমাদের বাজীমাৎ কব। ওর টিপস্ও মন্দ না।' বললো সাহেব নামে অভিহিত তরুণটি।

"না:, সায়েবকে নিয়ে আর পারি নে! এই তো চঞ্চল বলছে না মুনসী আসচে এখেনে। সায়েবকেই "চঞ্চলকুমার" বলা উচিত, কী বলিস, চঞ্চল?"

"তা আর কন কী কইর‍্যা? চঞ্চলকুমার হইতে গ্যালে কি আর এক ময়না লইয়া পইড়্যা থাকলে চলে? শতেক ময়না লইয়া কার-বার করতে হয়। আপনাগো সাহেবরে লইয়া তো আর তা চলবো না। কী যে পাইছে ঐ মন্দাদরির ফ্ল্যাটে? বরং আপনারে কওয়া চলে। এতোখানি বস হইল তবু সমানে চালাইয়া যাইতে আছেন। রোজ রোজ নতুন দোকানে খাওন, নতুন মাইয়া গাদন..."

"এ্যাই, চোপ! আস্তে!" ধমক দেয় সায়েব। "চারদিকে লোক।"

"আরে, না, না, ও ঠিক আচে। আমি সব বুঝে নিইচি।" চোখ

ঘুরিয়ে বলে চ্যাটার্জী। "তাছাড়া, বাবাসকল, এখেনে এয়োচো ফুর্তি করতে। এ তো বেহ্ম প্রার্থনাসভা নয়। এখেনেও যদি ভেবেচিন্তে কতা কইতে হয়, তালে আর কোতায় যাবে। আচ্ছা, শোনো, কাজের কতা তো হোচ্চেই না। কই রে, বাবা ইসমাইল, মাল দাও, বাপ্। কী, রে, চঞ্চল বাপধন, চলবে তো আরো, নাকি এই চন্নমেত্যই সার। বল্—"

"ব্যাপার হইল কী, চাটার্জীবাবু, আইজ টার্ন হইল সায়েবদার। কাইল তো আবার মাঠের পয়সা আনতে হইব। তাছাড়া, আমার তো আবার নানান জ্বালা। টেলিফোনের ছেমরি ছুইট্যা তো আবার মাসের শেষ সপ্তাহ হইলেই পয়সা চাইব। না দিয়াও পারন যায় না, ওরা অনেক ত্থায়-থোয়—মানে, লাইন আর কি। টেলিফোন না থাকলে তো, বোঝলেনই, কাম কাজ সব অচল। যাউক, সায়েবদা, ইসমালরে ডাকতাছি। আপনার মুনসী তো আইবহনে, যদিও দেরি আছে তার, সোওয়া নয়টার আগে নয়। ইসমা-ল!"

ওরা নতুন করে ড্রিংক নিল।

"হ্যাঁ, শোনো," চ্যাটার্জী একটু গলা খাটো করলো, "সায়েব তো ঐ অর্ডারটা পাশ করিয়ে নিয়েচে। ভালো কতা। অতোবড়ো অর্ডার পাস করবার ক্ষমতা তো আমাদের কর্তার নেই। অডিটে ধরবে। তবে অডিট আমি ম্যানেজ করবো। গেল বারে তো স্রেফ কফি-কাজু-রসগোল্লাতেই কাজ সেরেছিলুম; এবারে না হয় ওদের এ রসে ডোবাবো।" গেলাসটা তুলে ধরলে চ্যাটার্জী, তারপর একটা বড়ো সিপ করে, "এখন মালের ডেলিভারিটা তাড়াতাড়ি করানো দরকার। আর পুরোনো এস্টক সরিয়ে ফেলতে হবে, নাহলে, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেসনে ধরা পড়ে যাবো। তবে অডিট বেশি ফাজলামি করলে, হারামিপনা করলে, আমার হাতেও অস্ত্র আছে। ইউনিয়নের ছোঁড়াগুলোকে লেলিয়ে দেবো। বাড়াবাড়ি কল্লে আর টেঁকতে হবে না কোনো চাঁদুকে। তবে, সায়েব, তোমার সাম্প্রতিক

আচরণ নিয়ে কতা উঠেছে ; চঞ্চল তোমাকে নিয়েও। আমার তো চর রয়েছে চতুর্দিকে, সব মহলে।”

“আমার কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু চঞ্চলের কেন? ও তো বিশ্বস্ত কর্মী।”

“বিশ্বস্ত আর রইলো কোতায়! মেয়েমানুষ দেখলেই ওর শরীর চনমন করে। ঐ যে, সেই বিজ্ঞাপন চাইতে এয়েচিল ছুঁড়িটা। সেই যে সেদিন, সেই ঠসকওয়ালি মাগী। চঞ্চল তার সঙ্গে বদ রসিকতা করেচে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অবদি করে ফেলেচে। সে-ছুঁড়ি আবার হলো গিয়ে, হুঁ হুঁ! এক নেতার বাগদত্তা। সব জানাজানি, তুই, চঞ্চল ব্যাটা, একটু খপর না নিয়েই—”

“রাখেন তো!” চ্যাটার্জীকে থামিয়ে দেয় চঞ্চল। “মাইয়া মানুষ লইয়া কি কইর‍্যা কী করতে হয় আমার ঢের জানা আছে। ও আমি ঠিক কইর‍্যা লমুহনে। কিন্তু, চ্যাটার্জীদা, ক্যাশের আমদানি কিন্তু কইম্যা যাইতাছে।” চঞ্চল তাকালো সায়েবের দিকে।

একটু বিব্রত দেখালো সায়েবকে। প্রায় ধমকের সুরেই বললো —“ঠিক আছে, ঠিক আছে! ওর জন্যে অতো ভাবনা নেই।” গেলাস মুখে তুললো ও।

বয়কে ডেকে এবারে স্কচ হুইস্কি অর্ডার দিলো প্রশান্ত। তিন-জোড়া চোখের চকিত দৃষ্টি বিনিময় ঘটে গেলো। প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে, অনেকটা হেসে বললো চ্যাটার্জী—“সো, নাউ আর টেকিং হুইস্কি? ভেরি গুড। বাট, হোয়াই স্কচ, স্যার! ওর তো ভয়ানক দাম। ইণ্ডিয়ান হুইস্কি ভেরি গুড-ডিপ্লোমাট, ব্ল্যাক নাইট, ওলড ট্যাভারণ।”

“রিয়্যালি?” জিজ্ঞেস করে প্রশান্ত। “বাট হোয়াট ইয়্যু আর টেকিং?”

“হেওয়ার্ড। আমি ভালোবাসি এটা। আমি সব হুইস্কিই

ভালোবাসি। তবে স্কচ হুইস্কি নয়। হুঁঃ। কী সব দিনকাল ছিল, মিস্টার, এই কলকাতায়। জাপানী সাকুরা বিয়ার পাঁচ আনা ; স্কচ হুইস্কি ফার্পোতে একটাকা দুআনায়, তার সঙ্গে চীজ সসেজ। কতো খেয়েছি আমার ফ্রেণ্ড মিঃ কাপাড়িয়ার সঙ্গে।"

ওয়েটর বোতল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। প্রশান্ত বললো, ছোটা। তারপর ফস করে জিজ্ঞেস করলো চ্যাটার্জীকে, "উড য়্যু মাইণ্ড অ্যা ছোটা স্কচ ?"

"আঁ্যা, হ্যাঁ, নো, নো, নো! আঁ্যা,…ওয়েল, ইয়েস, হোয়েন ইউ সে, স্যর, ওয়েল…আফটার এ লং টাইম্‌, ওয়েল, ইন ইয়োর অনার, …থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।"

ওয়েটর চ্যাটার্জীকে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। ইঙ্গিতে ওকে থামালো প্রশান্ত। সামনেই দুই ছোকরাকে বললো "ইউ, জেণ্টলমেন, এ লিটল্‌ হুইস্কি ?"

বিনা বাক্যব্যয়ে ওরা ওদের গেলাস খালি করে এগিয়ে দিলো। বড়ো বড়ো চোখ করে তাকালো ওর দিকে। টাই পরা ছেলেটি শুধু বললো : থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ! ওরা সবাই গেলাস উঁচিয়ে বললো : চিয়ার্স!

চ্যাটার্জী এবারে খুবই ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলো। "ইউ, স্যর, আর ফ্রম হোয়্যার ?"

"ফ্রম ম্যাড্রাস।" প্রশান্ত মিথ্যে কথা বলতে পারে না, তবে প্রায়শই Suppressio veri Suggestio falsi র আশ্রয় নেয়।

"ইন বিজিনেস অর ইন সার্ভিস ?"

"ইন সার্ভিস।" এইরে, নাম না জিজ্ঞেস করে বসে! তখন তো আর "ইতি গজ" চলবে না।

"উই আর অলসো ইন সারভিস। আওয়ার অফিস ইজ ভেরি বিগ। আমি এনটায়ার এসটাবলিশমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্তা। আমার আণ্ডারে বহু লোক। দিস জেণ্টলম্যান," টাই-পরা ছেলে-

টিকে দেখিয়ে বলে, "প্রাইভেট সেকরেটারি টু দি চীফ। ব্রিলিয়াণ্ট ইয়ং ম্যান। আর ঐ ছেলেটি ভেরি ড্যাসিং এণ্ড পুসিং—পি, এ, টু দি চীফ। ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি ওদের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড।" স্কচের গেলাসে চুমুক দেয় ও।

"তুমি স্থানীয় লোক?" চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞেস করে প্রশান্ত।

"আমরা সবাই স্থানীয়," জবাব দেয় সায়েব। "মিঃ চ্যাটার্জী খুব সলিড—শ্রীরামপুরে দুখানা বাড়ি, প্রচুর আয়, বিরাট চাকরি। অবিশ্যি চাকরিটা কিছুই নয় আয়ের তুলনায়।" চঞ্চলকুমারকে দেখিয়ে বলে "কুড বি এ ভেরি গুড ফিলম্ স্টার। কলকাতায় বাড়ি আছে, কনেকশনস ভালো। আমি নিজে, ওয়েল, এ স্মল ম্যান—নো হাউস, নো মানি, নো ওয়াইফ—"

"বাট এ গুড জব, এ গুড অ্যাপিয়ারেন্স, এণ্ড এ পাওয়ারফুল পেন।" অনুপ্রবেশ ঘটলো চ্যাটার্জীর। "আমাদের আপিসের সর্বময় কর্তা তো প্রকৃতপক্ষে ও-ই। আর ঐ চঞ্চলকুমার? ইউ ওয়াণ্ট এনিথিং, হি উইল অ্যারেঞ্জ। ভেরি হেল্‌পফুল।"

"তা, তুমি তো শ্রীরামপুরে থাকো। তোমার বন্ধুরা?" জিজ্ঞেস করে প্রশান্ত। জবাবে জানলো সায়েব জানবাজারে থাকে আর চঞ্চলকুমার গড়িয়ায়। ও বললো ও খুব কাছেই থাকে।

প্রশান্তর গোল্‌ড ফ্লেকের প্যাকেটটা টেনে নিলো চ্যাটার্জী। হেসে বললো "আই অ্যাম টেকিং," সবাইকে একটা করে দিলো। দেশলাই জ্বেলে সেগুলো ধরালো চঞ্চলকুমার। বেশ জমে উঠলো ওদের।

"কিছু খাবার খাচ্ছেন না কেন?" জিজ্ঞেস করে চ্যাটার্জী।

"হ্যাঁ, খেতে হবে। কী খাওয়া যায় বলুন তো?"

"তন্দুরি কিছু খান—চিকেন। ইসমাইল, সাবকো তন্দুরি চিকেন।"

"আচ্ছা, গুড বেঙ্গলি ফুড পাওয়া যায় না কলকাতায়?

"নাঃ। ও খেতে গেলে কোনো বাড়িতে যেতে হবে।" সাফ জবাব চ্যাটার্জীর।

"কেন, কোনো ভালো বেঙ্গলি হোটেল নেই?" প্রশান্তকে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন দেখায়।

"না। দেখো, আমরা, বেঙ্গলিরা, ঠিক ব্যবসাবানিজ্য বুঝিনে. আমরা অন্য জিনিস নিয়ে থাকতে চাই।" বেশ জ্ঞানীর মতো কথা বললো চ্যাটার্জী।

"আমরা, সত্যি কথা বলতে গেলে, ইনটেলেকটের পূজারী," ব্যাপারটাকে আরো ব্যাখ্যা করলো সায়েব। "এই দেখো, এই দোকান পাঞ্জাবি-পরিচালিত; কিন্তু পেট্রনস্ বেশির ভাগ বাঙালি—ইনটেলেকচুয়াল বাঙালি। আমাদের, দেখো, এখানে অন্য খাতির। পাঞ্জাবিরা আমাদের ইনটেলেকচুয়াল বলে মানে। সারা ভারতবর্ষই মানে, এখনো। তা সে মুখে স্বীকার করুক আর না করুক।"

বিগত পনের বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল প্রশান্তর। কিন্তু, না, এখেনে এয়েচো, খাওয়া, ফুর্তি করতে। আর, আর কী? ও, জীবন দেখতে—বর্তমান বাঙালি জীবন।

প্রশান্ত মাথা দুলিয়ে সায় দিলো সায়েবের কথায়। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো বাঙালি কালচারের। তারপর আধুনিক বাঙালি যুবক-যুবতীদের কথা জিজ্ঞেস করলো।

চ্যাটার্জী বললো "যুবক তো দুজনের সঙ্গে আলাপ হলোই, পরে আরো হবে। এরা বুদ্ধিমান, কর্মঠ, পটু—নয়া বাংলার কর্ণধার বলতে গেলে। আর যুবতী? হেঁ হেঁ, স্যর, যদি চান তো সকল স্তরের যুবতীর সঙ্গে আমরা আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। এই এক চঞ্চলকুমারই ইচ্ছে করলে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে, আপনাকে এই পাড়াতেই অত্যন্ত রেসপেকটেবল তরুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে।"

আলোচনায় প্রকাশ পেলো কলকাতা শহরের সমস্ত স্তরের লোকের সঙ্গে এদের আলাপ আছে এবং হেন কাজ নেই যা এ-ত্রিমূর্তির অসাধ্য। চ্যাটার্জী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বনেদী লোকেদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। সায়েব ওরফে সেনের ঘনিষ্ঠতা শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-ইন্‌টেলেক-চুয়ালদের সঙ্গে। ঐ খানেই সে এক ডজন লোককে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখালো যাদের মধ্যে "মডার্ণ টাইম্‌স্" নামক দুর্দান্ত সাপ্তাহিকের সম্পাদক যুযুধান সেন, "অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান" দৈনিকের সহকারি সম্পাদক পারঙ্গম মজুমদার, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, "কামু কাফ্‌কার সগোত্র" বিবমিষা বসু, চিত্র পরিচালনায় নতুন ধারার পথিকৃৎ অভীক ভট্ট, চিত্রশিল্পী গোপালক ঘোষ, অভিনেতা অনিন্দ্য-কুমার, নিছক ইন্‌টেলেকচুয়াল অনিত্য বর্ধন রয়েছে। চঞ্চলকুমারের ক্ষেত্রটা আলাদা—সে কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন তরুণীর পরিচিত এবং তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। ওর নাকি অদ্ভুত পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্!

বেশ লাগছে এখন কথাগুলো শুনতে। দেখো, একেই, বলে যোগাযোগ। তবে, আজ এই পর্যন্তই থাক। অনেকটাই হয়েগেলো। অবিশ্যি বিলের বহরে ভয় পাবার কিছু নেই—পার্স ভর্তি টাকা।

ইতিমধ্যে ওরা আরো গোটা দুই রাউণ্ড ড্রিংক্‌স্ নিয়েছে। প্রশান্ত নেয় নি। মনে মনে ওর পানীয়ের হিসেব করলো প্রশান্ত। একটা বিয়ার, দুটো জিন। আধখানা স্কচ। আর আধখানা স্কচ নিয়ে মধুরেন সমাপয়েৎ হোক, ভাবলো ও।

ওয়েটার ওকে ছোটো স্কচ দিচ্ছে—এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো চ্যাটার্জী সেদিকে। প্রশান্ত একবার ভাবলো, যাক, ওকে আর দেবো না; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, আহা বেচারা, খাক আরেকটু! বললো, হ্যাভ অ্যানাদার ছোটা অন মি? "ইয়েস, ইয়েস। আমাদের বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে, একবার দিতে

নেই। তবে, হোয়াই স্কচ? ওর দামে অন্য জিনিস চারটে হয়ে যায়। আমাদের হেওয়ার্ড ভালো। ইসমাইল!"

ওরা ওদের পানীয় পুরো পেগ নিল।

গেলাস শেষ করে প্রশান্ত ঘড়ি দেখলো। প্রায় সাড়ে নটা বাজে।

"কই হে, তোমাদের মুনসী গেলো কোতা?" চ্যাটার্জীর প্রশ্ন। "ত্থাখেন না আরাকটু।" চঞ্চলের জবাব। প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল—বাথরুমে যাবে।

পা-মাথা বেশ টলছে—বেশ নেশা-নেশা লাগছে। বহুদিন পরে, এবং অনেকক্ষণ ধরে তো! তবে, মগজ সাফ রয়েছে। "আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা" কথাটা নিশ্চয়ই মদ্যপান করে লেখা।

বাথরুমে মনে মনে মোটামুটি ও একটা হিসেব করে ফেললো। ও যা খেয়েছে তাতে গোটা তিরিশ টাকা আর ওদের জন্যে গোটা কুড়ি—ব্যস্! পঞ্চাশেই হয়ে যাবে। একটু বেশি খরচা—তা হোক। যোগাযোগ হলো, মজায় কাটলো সময়, চরিত্র দেখা হলো, এবং আরো বহু দেখবার, জানবার সুযোগ হয়ে বইলো। হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে, চুলটুল আঁচড়ে, পার্সটায় হাত বুলিয়ে ও যখন ফিরলো তখন ঘরভর্তি লোক, আর ওর টেবিলে দেখলো বাক-বিতণ্ডা চলছে। ওকে দেখে চুপ করলো সবাই, কেবল চঞ্চলের একটি বিরক্তি মাখানো উক্তি কানে এলো—ইসমা-লরে আর ডাটানো যাইব না।

ওয়েটরকে বললো পেমেণ্ট নিতে। বেশ মাথা ঘুরছে। ওয়েটর একগাদা বিল বাড়িয়ে ধরলো। পন্সিলে লেখা দেখার সময় বা মেজাজ নয় এখন। কিৎনা? উন্সত্তর রূপয়া। এতো কেন? তাহলে কি ওর খেয়াল নেই ও কতো খেয়ে ফেলেছে! মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি। মরুকগে! টাকা দিয়ে দিলো।

চ্যাটার্জী বললো—"তুমি আমাদের জন্যে আজ অনেক করলে। এর পরদিন তুমি আমাদের গেস্ট। এখানে আমরা প্রায়ই আসি। আবার দেখা হবে। হিঃক!"

ব্যালান্স নিয়ে, ওয়েটরকে মোটা বকশিশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও। বাইরে আসতেই জিজ্ঞেস করলো সায়েব—"এখন কোনদিকে?"

"এখন একটু ময়দানে ঘুরবো ট্যাকসি নিয়ে।" বললে প্রশান্ত।

"অন্য কোনো প্রোগ্রাম নেই তো?" হেসে জিজ্ঞেস করলো সায়েব।

"না।" সহজ জবাব প্রশান্তর।

"তাহলে লেটআস টেক এ ট্যাক্সি। তোমারও ঘোরা হবে, আমরাও লিফ্‌ট্ পাবো।" বলেই একখানা চলন্ত ট্যাকসি দাঁড় করালো ওরা, আর প্রশান্তকে নিয়ে দ্রুত চেপে বসলো তাতে। প্রশান্ত একবার একটু অস্বস্তি বোধ করলো। কিন্তু সেটা সাময়িক। গাড়ি চললো ধর্মতলা-অভিমুখে।

গাড়িতে ওরা টুকিটাকি কথা বলছে, প্রশান্ত এককোণে নির্বাক পড়ে আছে। ওদের সব কথা অবিশ্যি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে এসে একটা সিনেমা হাউসের কাছে নেমে গেলো চঞ্চলকুমার। সায়েবের কথামতো ট্যাকসি চলতে লাগলো সোজা।

সায়েব ওরফে সেন বললো—"জানো, চ্যাটার্জীদা, ও হারামি গেলো 'সম্বরে', মুন্‌সী বোধহয় ওখানেই রয়েছে। ওর বড্ডো বাড় বেড়েছে! ওকে খুব বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।"

চ্যাটার্জী বলল—"তা বললে কী হবে! ওর হাতে তো আমরা সবাই বাঁধা। ফাইলের ব্যাপার থেকে টাকাপয়সা, মেয়েমানুষ। ওকে না ঘাটানোই ভালো।"

"আরে, রাখো তুমি। ব্যাটার জায়গা জুতোর ডগায়, উঠে বসতে চায় মাথায়! জবরদখল জমিতে গরমেণ্ট লোন নিয়ে বাড়ি করে

আর মেয়েছেলের দালালি করে রোজগার করে ও বড্ডো বেশি ফুলে উঠেছে। শুয়ারকা বাচ্চা, রেফিউজী।”

বিডন স্কোয়ারে নামলো সেন। গাড়ি ঘোরাতে বললো চ্যাটার্জী। তারপর প্রশান্তকে উদ্দেশ করে বললো—“মিস্টার স্লীপিং? নো? হ্যাভিং ফান?”

একটু হাসলো প্রশান্ত।

“বেশ ভালো লাগছে তোমার সঙ্গ,” বললো চ্যাটার্জী। “আমি গাড়িটা হাওড়া স্টেশন অবধি নিয়ে যাচ্ছি। গঙ্গার হাওয়া তোমার ভালো লাগবে।” একটু থেমে—“ঐ যে ইয়ং ম্যান, সেন, ভীষণ কিপটে। ও এখন গেলো ওর মেয়েমানুষের কাছে। বলে বেড়ায় অবিবাহিত—সব বাজে কথা। ওর বউ আছে বর্ধমানের গ্রামে। তার উলঙ্গ ছবি ও দেখিয়ে বেড়ায় সব বড়ো অফিসরদের আর পয়সা রোজগার করে। ওকে সাবধান।” প্রশান্ত নিশ্চুপ।

হাওড়া ব্রীজে গাড়ি উঠলো। গঙ্গার হাওয়া এখন আর অতো স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে না। হঠাৎ বললো চ্যাটার্জী— “মিস্টার, ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান কাম টু মাই প্লেস টোডে। সিরামপোর—নট ভেরি ফার। ইউ ক্যান কাম ব্যাক ইন দিস ট্যাক্সি। অর ইউ ক্যান স্টে, ইউ আর এ মানিড ম্যান। আমার স্ত্রী নেই, তবে চারটি বড়ো বড়ো মেয়ে আছে। তারা তোমার যত্ন করবে।” প্রশান্ত নিশ্চুপ।

হাওড়া স্টেশনে চ্যাটার্জী নেমে গেলো।

* * * * *

আঞ্চলিক আপিসে পৌঁছতেই এগারোটা বাজলো। আজ আবার শনিবার। সেখান থেকে নির্দেশ নিয়ে শাখা অফিসে যেতে বারোটা বেজে গেলো। ভাগ্য ভালো, আপিসের গাড়ি পেয়েছিলো।

আপিস প্রায় ফাঁকা। ভারপ্রাপ্ত অফিসর তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

"আসুন, আসুন। দেরি হল যে? এই নিন, চার্জ হ্যানডিংওভার টেকিং-ওভার ফর্ম তৈরী করে রেখেছি। সই করুন। আমিও করছি।" বেল টিপলেন ভদ্রলোক।

দুতিনবার বেল টেপার পরে এলো এক বেয়ারা।

"সে কোথায়?" জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

"দেখছি না।" বললো বেয়ারা।

"তাকে, আর পি এ কে ডেকে আনো।" ভদ্রলোক ঈষৎ উষ্ণ।

কাগজপত্তর বুঝিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন—"আপনার আণ্ডারে তিনজন অফিসর—তাঁদের একজন অসুস্থ, এক-জনের মেয়ের বিয়ে, আরেকজনের শনিবার।"

শেষের কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না প্রশান্তর। জিজ্ঞেস করায় শুনলো—"আর কি, ঘোড়ার মাঠ! দেখছেন না কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। শনিবারে বারোটার পরে বিশেষ কাউকে পাওয়া যায় না। অন্য কাউকে না পেলেও ততো অসুবিধে নেই, কিন্তু আপনার বেয়ারা, পি. এ., এদের সঙ্গে তো পরিচয় করতে হবে। ওদের বলেও রেখেছি।"

কথা শেষ হবার আগেই পরপর ঢুকলো তিনটি লোক। এরা কারা? হুবহু কালকের সেই তিনমূর্তি! চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললো প্রশান্ত। মাথা টলছে, দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ভদ্রলোক বলে চলেছেন—ইনি গুণধর চ্যাটার্জী—স্টোরের বড়োবাবু। ইনি দেবু সেন, পি এ। তার ওটা আমার খাস বেয়ারা—চঞ্চল পরামানিক—এখন থেকে আপনার। এদের উপরে আপনি নির্ভর করতে পারেন। আর ইনি মিঃ মজুমদার—তোমাদের নতুন অফিসর ইন-চার্জ। আপনি আলাপ করুন এদের সঙ্গে, আমি বাথরুম থেকে আসছি।"

অঘটন নাকি আজও ঘটে। তাহলে, ভাবলো প্রশান্ত, এই মুহূর্তে মেঝেটা ফাঁক হয়ে ওকে গ্রাস করে নিচ্ছেনা কেন!

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই গলা খাঁকারি দিলো চাটুজ্যে, অত্যন্ত

সপ্রতিভভাবে বললো "আলাপ তো আমাদের অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে, কী বলেন, স্যার ? কী বলো সায়েব ? কী বলো চঞ্চল-কুমার ? ওরা সমস্বরে বললো—হ্যাঁ, তা আর বলতে ! প্রশান্ত তাকিয়ে দেখে তিনটি মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। চোখ নামিয়ে নিলো আর একদম বোবা হয়ে বসে রইলো ভদ্রলোক না ফেরা পর্যন্ত। ফিরে আসতেই বললো, "আজ আমি উঠি। শরীরটা ভালো নেই।"

সোজা গেস্ট হাউসে ফিরে দুখানা দরখাস্ত লিখে ফেললো প্রশান্ত। একখানা আঞ্চলিক আপিসে—লম্বা ছুটি চেয়ে; আরেকখানা হেড আপিসে-ট্রান্সফার চেয়ে : কলকাতার বাইরে—বাংলাদেশের বাইরে।

প্রতীক
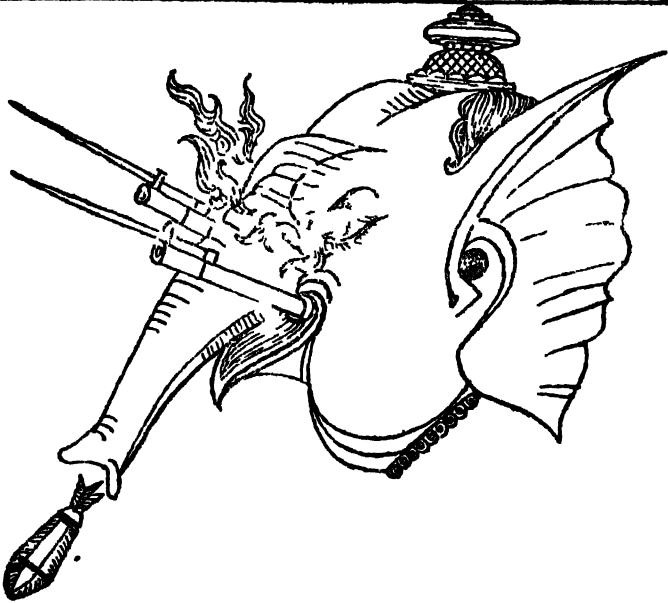
"চিঠি লিখে কাজ হবে না, টেলিফোন করেও না। আপনি নিজে একবার যান। দেখা করুন পার্টির সঙ্গে, বোঝানোর চেষ্টা করুন। যাবার আগে টেলিফোন করে যাবেন।" বললেন ব্যানার্জি সায়েব।

"আচ্ছা, স্যর। বললো প্রদীপ এবং পরমুহূর্তেই টেলিফোন করলো গোয়েঙ্কাকে।

গোয়েঙ্কা গদিতেই ছিলো। সময় দিলো চারটে।

চারটের সময় গোয়েঙ্কার গদিতে গিয়ে হাজির হলো প্রদীপ্ মহাত্মা গান্ধী রোডে। আর তখন থেকে পুরো দুটি ঘণ্টা ওর যতো বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধৈর্য, চার্ম—সমস্ত কিছু ব্যবহার করেও গোয়েঙ্কাকে

ওর পথে আনতে পারেনি, মানে ওর আপিসের বক্তব্যে রাজী করাতে পারেনি। শোনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হিটলারকে সবচেয়ে বেশি ঘায়েল করেছিলেন মলোটোফ—বের্লিন আলোচনাকালে। নিজেকে হিটলার না ভাবলেও গোয়েঙ্কাকে মলোটোফ ভাবতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না ওর। রওনা হবার সময়ে প্রদীপ ভেবেছিলো—কতো সমুদ্র পেরিয়ে এলাম, গোয়েঙ্কা-গোষ্পদ তুড়ি মেরে ডিঙিয়ে যাবো। হায়! ছটার সময়ে গোয়েঙ্কার দেওয়া শেষ পানটি চিবুতে চিবুতে ও যখন নমস্কার করে বেরিয়ে এলো তখন মনে হলো এতোটা ঘায়েল আর কোনোদিনও কোনো পার্টি করেনি ওকে, এতোটা নিষ্ফল হয়নি আর কোনো নিগোশিয়েশনে।

কী বললো গোয়েঙ্কা—বানিয়া কখনও তার হক্ ছাড়বে না। আর যেখানে তার কোনো ত্রুটি নেই সেখানে অতোগুলো টাকা বেয়াজ দিতে সে যাবে কেন? কানুন? কানুন তো মানুষের সুবিধের জন্যে, অসুবিধের জন্যে নয়। হ্যাঁ, জানে গোয়েঙ্কা, হাল আমলের গরমিণ্ট কিছু গ্যরকানুনী কানুন বানিয়েছে। তা তার জন্যে যদি মাথা মুড়োতেই হয় তো সে একলা কেন, আপ ভি মিলিয়ে হম্‌সে।

গোয়েঙ্কার গদিতে পৌঁছেই আপিসের গাড়িটা ছড়ে দিয়েছিলো প্রদীপ। এখন এই ছটার সময়ে কলকাতা শহরে কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, কতোটাই বা রাস্তা। হেঁটে যাওয়া যাক। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে এসে এক ঠোঙা সেও ভাজা কিনে দাঁতে কাটতে কাটতে এগিয়ে চললো প্রদীপ এসপ্ল্যানেডমুখো।

মহম্মদ আলি পার্ক। অনেক লোকজন ঢুকছে, অনেক গাড়িও দাঁড়িয়ে। ব্যানার দেখলো প্রদীপ—কোন এক ধর্মসমাজীদের এক সম্মেলন। ভিতর থেকে বক্তৃতার আওয়াজ আসছে। ঢুকতে পয়সা লাগবে নাকি? না হলে গিয়ে বসা যেতো। সেই কেমন কাঠের বেঞ্চে বসে বাদাম ছাড়িয়ে খেতে খেতে পার্কে বক্তৃতা

শোনা। কতোকাল যে এসব জিনিস করা হয় না। মাথাটা ভারি হয়ে আছে এখন, একটু পাতলা করার দরকার। পার্কের বক্তৃতায় বেশ মজা পাওয়া যায়। ঢুকে পড়লো প্রদীপ।

না, টিকিট চাইলো না কেউ। মস্ত শামিয়ানা খাটানো, তার তলায় সব ফোলডিং চেয়ার। এক কোণে মঞ্চ, তার উপরে অনেক লোক বসে। মেয়ে পুরুষ অনেক জমায়েত হয়েছে, তবু এখনও অনেক চেয়ার খালি। প্রদীপ চেয়ারে বসলো না, এককোণে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন একজন চমৎকার, সহজবোধ্য হিন্দিতে। সনাতন হিন্দু ধরমে অনেক গলদ, আমাদের কাজ সে গলদ দূরীকরণ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে সনাতন ধর্মকে। যুগে যুগে কালে কালে অনেক সংস্কারক তা করেছেন বলেই আজও সমাতন ধর্ম অটল। হিমালয়সে কনিয়া-কুমারী, কচ্ছ্ সে কামরূপ—আজ ভী উও ধরম কা রূপ প্রকটিৎ হ্যায়। তব, দেখিয়ে, এক বাৎ। যতোই আমরা হিন্দুধর্মের সমালোচনা করি, সংস্কার সাধন করি, খেয়াল রাখনা—তৃতীয় কোন ধর্মমত যেন আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি না করে।…প্রচণ্ড হাততালি পড়লো এখানটায়।…আচ্ছা, পেয়ারে ভাইয়োঁ অর বেহনোঁ, অনেক কথা আমাদের বলবার আছে। এখন আমরা একটু গানাবাজানা করবো। যে-গান এখানে করা হবে এখন তার মধ্যে দিয়ে আপনারা পাবেন হিন্দুধর্মের প্রতীকতত্ত্ব বিশ্লেষণ; গান ও ব্যাখ্যা সহযোগে আপনাদের সামনে তা প্রস্তুত করছেন আচারিয়া মকুন্দলাল।

গান-বাজনার আকর্ষণই আলাদা। অনেক লোক যারা এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, সবাই একে একে গিয়ে বসলো খালি চেয়ারগুলোয়। প্রদীপও একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো। সেউয়ের ঠোঙাটা ওর ফুরোয়নি তখনও।

মাথায় টুপি, ভুঁড়িওলা এক প্রৌঢ় গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাইকের সামনে। ঝম ঝম করে অনেকক্ষণ হারমোনিয়াম বাজানোর পরে ধরলো গান। সত্যযুগমে যব দানবেরা স্বর্গরাজ্যে সুরু করলো অত্যাচার, তখন দেবতারা অনেক ভেবে-চিন্তে করলেন এক যন্ত্র-দেবতা তৈয়ার। (অত্যাচার এবং তৈয়ারে অন্ত্যমিল।) সেই যন্ত্রদেবতার নাম দিলেন তাঁরা বিঘ্ননাশকর, বললেন সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধি সেই দেবতা দিয়েছিলেন, কারণ যুদ্ধের পক্ষে সে-যন্ত্র ছিলো তুলনাহীন। একদন্তটা একটা লেভার; মহাকায় তো হবেই, কারণ ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিলেন অসংখ্য দেবতা; লম্বোদর—কারণ পেটের মধ্যে ম্যাগাজিন; গজানন—সবচেয়ে মূল রহস্য লুকিয়ে আছে ওখানেই। আমরা সমস্ত দেবতার আকৃতিই করেছি মানুষের মতো, কিন্তু এই দেবতা, যাঁর পূজো দিতে হয় সর্বাগ্রে—নিয়ে ওরকম কল্পনা করতে গেলাম কেন —হাতির শুঁড় কেন দেবতার স্কন্ধে বসালাম? আরে ওটা তো শুঁড় নয়—ও যে অ্যান্টিএয়ারগান।·· ব্যাখ্যা-সহযোগে এই গান দারুণ ভালো লাগছে সকলের, প্রশংসাসূচক 'ওয়াহ্' 'ওয়াহ্' চতুর্দিকে।...ঐ এক যন্ত্রেই সব কুপোকাৎ। ওর ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে সব দুর্ধর্ষ দেবযোদ্ধা, ওর কানের ফুটো দিয়ে সব কামান দাগছে, আবার মস্ত মস্ত কান দুটো দিয়ে ফুটোগুলো দিচ্ছে ঢেকে, ওর শুঁড়টা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান, পেটের ভিতর অফুরন্ত গোলাবারুদ।....প্রদীপের মনে হলো এ এমন একটা যন্ত্র যা ট্রজান হর্স আর শেরম্যান ট্যাংকের সংমিশ্রণ। আর সত্য যুগের ব্যাপার যখন, তখন এর অতিকায়ত্ব, গতি এবং ম্যানুভাসেবিলিটি তো তুলনাহীন। শুঁড়টাকে তুলে অ্যান্টি-এয়ায়ক্র্যাফট গান করবার চিত্রটা মনে আসতেই ও হেসে ফেললো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে চাপা গলায় কে বললো—ননসেন্স!

কান লাল হয়ে গেলো প্রদীপের। ভারি অন্যায় হয়েছে ওর

এখানে এভাবে হেসে ফেলাটা। সভা-সমিতিতে বিহেভ করতে না পারলে শাস্তি তো পেতেই হবে। পালাতে ইচ্ছে করলো ওর। গান আর কিছু কানেও ঢুকছে না। ঠিক এই মুহূর্তে গানের অংশবিশেষ ভালো লাগায় শ্রোতারা জয়ধ্বনি করলো গায়কের, আর ঠিক সেই ফাঁকে প্রদীপ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সীট থেকেও এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। সর্বনাশ! এ নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোক যিনি ওর চাপল্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কপালে দুঃখ আছে ওর। আজকের দিনটাই বড়ো অপয়া!

তব দেখিয়ে, একবাৎ।

"শুনিয়ে", বললেন ভদ্রলোক। দাঁড়ালো প্রদীপ। "আপ কেয়া আরিয়াসমাজী হেঁ ইয়া সনাতনী?" জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

"সনাতনী।" জবাব দেয় প্রদীপ। জবাব শুনে হেসে ফেলেন ভদ্রলোক। আবছা আলোয় দেখে—বছর পঞ্চাশেক বয়সের সবল, শক্ত একটি লোক, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টুপি। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, যদিও সে বাংলায় হিন্দুস্থানী টান আছে, "আপনি বাঙ্গালি। তাই বলুন।"

প্রদীপ বুঝলো 'স'টাকে ও তালু থেকে উচ্চারণ করায় ভদ্রলোক

এক নিমেষেই ধরে নিয়েছেন ও কোন প্রান্তের লোক। কিন্তু মতলবটা কী ভদ্রলোকের!

ভদ্রলোকই জানালেন। "আপনি মীটিংএ এসেছিলেন নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমিও তাই। আমিও সনাতনী, তবে সনাতন ধর্মের সব সংস্কারকে শ্রদ্ধা করি। হিন্দুধর্ম কী অদ্ভুত, না? কী উদার! উদার বলেই যার যা খুশি বলে যায়। আধুনিকতার নামে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে, যা তা বললেই হলো? দেখলেন তো গণেশজীউকে কেমন পেন্ট করলো। আপনি হাসলেন—হাস্যকরই যে ও-ব্যাখ্যা। গণপতিকে যদি বর্তমানের আলোয় গণদেবতা, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, জনসাধারণ, ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতো তাহলে বুঝতাম রাইট অ্যাপ্রোচ। এসব কী?"

উঃ! বাঁচা গেলো। অসন্তুষ্ট নন, ভদ্রলোক ওর মধ্যে সমাদর্শ খুঁজে পেয়েছেন।

প্রদীপ হেসে বলে--"দেখুন, ধর্ম-টর্ম নিয়ে তো মাথা ঘামাইনে ঠিক, তবে পথে যেতে যেতে কৌতূহল হলো, ঢুকে পড়লাম। হ্যাঁ, গণেশদেবতা নিয়ে আপনি যে রকম বললেন ঐ রকম একটা আলোচনা আছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে।"

"আছে নাকি? কার লেখা বলুন তো? আমি তো বাংলা লেখা খুব পড়ি। আমার জন্ম-কর্ম সব এখানেই। নাম রামকুমার জৈন। আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমার নাম প্রদীপ রায়। থাকি ধর্মতলা; চাকরি করি। লেখাটি স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তের।"

"অতুলচন্দ্র গুপ্তা, যিনি বড়ে অ্যাডভোকেট ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, দেখবো তো। দেখুন আমি ব্যবসা করি—সরষের

তেলের পাইকারি ব্যবসা। পৈতৃক ব্যবসা। গদি পোস্তায়। অবসর সময়ে একটু-আধটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করি। বাংলা সাহিত্যে আমি কিছুটা পড়েছি—মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারপর ধরুন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, হাল আমলের আরো কেউ কেউ। ধর্মগ্রন্থও পড়ি। ধর্মের নতুন ব্যাখ্যায় আমার ইন্টারেস্ট আছে। শ্রীঅরবিন্দের ওয়ার্কসও কিছু কিছু পড়েছি। হিন্দিতেও অনেক ধর্মালোচনা হয়েছে—তাও কিছু কিছু পড়েছি। এই সভায় অনেক আগ্রহ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু দেখলাম, এরা না একেলে না সেকেলে। আসুন, সিগারেট খান।" সিগরেট এগিয়ে দিলেন জৈন।

চমৎকার লোক তো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো জৈনকে। মাজামাজা বাদামী রং, বড়ো বড়ো চোখ, দাঁড়ানোর ভঙ্গী ঋজু।

"আপনার অসুবিধা করছি না তো? কাজ নাই তো?" ব্যস্ত হয়ে বলেন জৈন।

"বিন্দুমাত্র না। কাজ নেই বলেই তো ঢুকেছিলাম এখানে।" মুখভর্তি উদার হাসি প্রদীপের।

"তাহলে আসুন, ঐ ফাঁকা জায়গাটায় বসি একটু।" জৈন যেন কতকালের আলাপী। "দেখুন, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না বললেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনি ধার্মিক লোক। ধর্ম কথাটা আমি এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি না। ধর্ম তো আসলে একটাই—মানুষের ধর্ম। আপনি রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" পড়েছেন নিশ্চয়ই। মানুষের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে আমাদের সনাতন ধর্মে। এতো ইনটেলেকচুয়াল ফ্রীডম আর কোন ধর্মে আছে, বলুন। এতো ডগমা-বিবর্জিত ধর্মমত? তবে বড়ো অপব্যাখ্যা হয়েছে এ-ধর্মের—নিরন্তর হয়। শুনেছিলাম, প্রতীকতত্ত্ব খুব ভালো ব্যাখ্যা করেন এই সমাজীরা—তাই এলাম।" কিন্তু শুনলেন তো ব্যাখ্যা!" হাসিটা আহত শোনালো জৈনের।

"জৈনজী, আমাদের মূর্তি-পুজোকে অতো প্রতীকী করে তোলবার দরকার কী—বলুন তো? আমার তো মনে হয় শাস্ত্রের সব জিনিসকে প্রতীক হিসেবে দেখাতে গিয়েই আমরা সব কিছুর অপব্যাখ্যা করে বসেছি। তাই রামায়ণে আমরা এরোপ্লেন খুঁজি, বাণের মধ্যে বোমা।"

"না, অতোটা বাড়াবাড়ি। যেমন, আজকে এখানে যে ব্যাখ্যা শুনলাম। আসল ব্যাপার হলো, লৌকিক-অলৌকিক ভাগ করতে পারা। অলৌকিক যা কিছু তা বুঝতে গেলে মীস্টিক হতে হবে, অনুভূতির জগতে চলে যেতে হবে। কিন্তু যে-জিনিস, যে-শাস্ত্র, যে-দেবতা, লৌকিক তা তো আপনাকে র‍্যাশনালি—যুক্তি দিয়ে, বিচার করতে হবে। দেখুন, আমি ব্যবসায়ী মানুষ। গণেশজী আমাদের দেবতা। আমার গদিতে গেলে, বা যে কোনো ব্যবসায়ীর গদিতে গেলে, দেখতে পাবেন সিন্দুর লেপা গণেশজীর মূর্তি। ওঁকে আমরা সিদ্ধিদাতা বলি। কিন্তু কেন বলি? ওঁর ঐ রকম আকৃতিই বা কেন? আমি যদি বলি, জনসাধারণের প্রতিভূ উনি। জনসাধারণ—খদ্দের—নিয়েই আমাদের কারবার। জনসাধারণের দেহ বিরাট, উদর বিশাল, বুদ্ধি সংকীর্ণ—এই জিনিসগুলোই তো ব্যবসায়ীদের সিদ্ধি আনয়ন করে। তাই না?"

"ঠিক কথা। আমার অবিশ্যি ঠিক ঠিক স্মরণ নেই, তবে কিছুটা এই ধরনের কথাই অতুল গুপ্ত মশাই বলেছেন।" মনে মনে চমৎকৃত প্রদীপ।

"বলেছেন নাকি? তাহলে তো ওঁর লেখা আমাকে পড়তে হবে। আমার এক বাঙ্গালি পাবলিশার বন্ধু আছেন—তাঁকে বলবো জোগাড় করে দিতে। কিন্তু পড়বো কখন? ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে যা ঝামেলা কাজকাল! গরমেণ্ট আর কিছু করতে দেবে না। বড়ো বড়ো ইনডাসট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে দোস্তি গরমেণ্টের, আমাদের মতো মার্চেণ্ট ওঁদের চক্ষুশূল। প্রোডাকশন নাই, স্টেটে স্টেটে রাইভ্যালরি,

এক এক রাজ্য সরকারের এক এক পলসি—কী করে কী হবে। হোর্ডিং হোর্ডিং করে চেঁচায় জনতা—ব্যবসায়ীরা হোর্ডিং করবে কোথায়? প্রোডাকশন কম হলে হোর্ডিং হবেই, কিন্তু সে হোর্ডিং তো করছে প্রডিউসার। ধরো তাদের। আমরা তো স্রেফ ডিসট্রি-বিউটর। তারপর ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আছে কিছু অসাধু লোক। কিন্তু অসাধু লোক নেই কোন্ শ্রেণীতে? তার জন্যে গোটা কম্যুনিটির বদনাম!" শেষের দিকে গলাটা একটু ধরে এলো জৈনজীর।

"সত্যি।" সমবেদনা জানালো প্রদীপ। হঠাৎ খেয়াল হলো সরষের তেলের পাইকারি ব্যবসা ভদ্রলোকের, বললো—"আচ্ছা, সরষের তেলের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনে। গেলো বছর অতো বড়ো ক্রাইসিস গেলো, আবার যখন তেল বেশ সহজলভ্য তখন গবমেণ্ট চড়া দাম বেঁধে দিলো। এবারে আবার অনেকদিন থেকেই দাম চড়তে সুরু করেছে—ঠিক আগের মতো ভালো তেল পাচ্ছিও নে।" জৈনজীর মুখের দিকে তাকালো ও।

"ব্যাপার হয়েছে কী—ঐ যে বললাম, কড়ুয়া তেল, মানে সরষের তেল, দরকার সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু সরষে হয় না এখানে। সরষে উৎপন্ন হবে অন্য রাজ্যে, তেল তৈরী হবে অন্য রাজ্যে, তারপর নানারকম ডিউটি দিয়ে সেটা যখন এখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে এলো, তারা গুদাম ভাড়া দিয়ে, অন্যান্য খরচ দিয়ে, আর সরকারী দামে বিক্রী করে উঠতে পারে না। ব্যবসায়ী তো লস দিতে পারে না—সেটা তার অন্যায়। লাভ হচ্ছে তার হক্। আরেকটা জিনিস কিন্তু আমরা ভাবি না, মিঃ রায়। সব জিনিসের দাম বেড়েছে, অতএব, তেলের দরও বাড়বে বৈকি।"

"হ্যাঁ, তা, অবিশ্যি....হ্যাঁ, তবে কিনা....বড্ডো বেশি, মানে... অ্যাঁ হ্যাঁ...." আমতা আমতা করে প্রদীপ।

"আপনার কি তেলের দরকার আছে?" জিজ্ঞেস করেন জৈনজী।

"খানিকটা ভালো তেল পেলে তো ভালোই হতো। আমাদের মুদির দোকানে যা পাই তা ভালো না। সিলকরা টিনের তেলও সব সময় ভালো হয় না। শুনি যে আজকাল কতো রকম সেন্ট টেস্ট..."

"ওসব বাজে কথা। আচ্ছা, এই নিন আমার কার্ড। আপনার ঠিকানাটা আমায় দিন। যখন দরকার হবে, খবর দেবেন। আমি তেল পাঠিয়ে দেবো আপনাকে।"

নিজের ঠিকানা লিখে জৈনজীর হাতে দিলো প্রদীপ।

"চলুন, ওঠা যাক।" বললেন জৈনজী।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে পান খাওয়ালেন জৈন। তারপর নিজের গাড়িতে উঠতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার তো উলটো দিকে। আচ্ছা, সময় পেলে একবার পায়ের ধুলো দেবেন আমার গদিতে। ঠিকানা তো রয়েইছে।" চলে গেলেন উনি।

বাস্তবিক, একেই বলে যোগাযোগ। কোথায় মহম্মদ আলি পার্ক, যেখানে কোনোকালে আসে না, সেখানে ঢুকলো ধর্মসমাজের বক্তৃতা শুনতে, আর আলাপ হলো একটি সরষের তেলের আড়তদারের সঙ্গে। আবার যেমন তেমন আড়তদার ন্য়, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত। সরষের তেল একটা মারাত্মক জিনিস এ-যুগে, এ-রাজ্যে। একটা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ হয়ে রইলো। অলকাকে গিয়ে বললো রামকুমার জৈনের কথা।

*　　*　　*　　*

বেলায় ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস প্রদীপের। সেদিন খুব সকালেই ওকে টেনে তুললো অলকা। কী ব্যাপার? "দেখো, দেখো, তোমার রামকুমার জৈনের খবর দেখো। এই যে, এখানে—কোর্ট কেসের খবরে।" অলকার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর।

আদালতের খবর পড়লো প্রদীপ। সত্যিই তো, চড়া দামে সরষের তেল বিক্রীর জন্যে গণপৎকুমার লছমনগোপালের দুই

মালিক, রামকুমার জৈন আর ব্রিজলাল ডালমিয়ার পাঁচ হাজার টাকা ফাইন হয়েছে। অমন ভাল লোকের জরিমানা। ভালো লাগলো না খবরটা। একবার ভাবলো টেলিফোন করে, আবার কী ভেবে করলো না।

কিন্তু টেলিফোন করতে হলো দিনতিনেক বাদেই। অলকা নোটিস দিলো—সরষের তেল ফুরিয়েছে। অতএব—

"জৈনজী, আমি রায়—প্রদীপ রায়। মনে আছে আমার কথা। সেই যে মহম্মদ আলি পার্কে....।"

"হাঁ, হাঁ। কতোটা দরকার বলুন। বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো লোক দিয়ে। বিশ কে. জি?" ব্যবসায়ী মানুষের কিছু ভুল হয় না, দেখো। অন্য লোক হলে পরিচয় ঝালাতেই লাগতো আধঘণ্টা।

"না, অতো কী হবে! চার-পাঁচ কে জি হলেই চলবে।" ওর কম আর বলা যায় কী করে!

"ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা পাঠিয়ে দেবো। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ঠিক সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে গেলো তেল। বাহকের হাতে একটি কাগজে স্লিপে দাম লেখা। এ কী! পাঁচ টাকা কে জি! মুদিও তো চার টাকার বেশি নেয় না।

এতো দাম কেন? জিজ্ঞেস করে লোকটাকে।

"হামি কুছু জানে না, সাহেব। বাবু বলেছে দাম না পেলে তেল ফেরৎ নিয়ে যেতে।" বলে লোকটা।

একবার ভাবলো ফেরৎ দিয়ে দেয়। আবার ভাবলো, না, দামটা দিয়েই দিই। পরে এ নিয়ে কথা বললেই হবে। দিয়ে দিলো দাম। ভাগ্যিস টাকাটা ঘরেই ছিলো।

পরদিন শনিবার, আপিস ছুটির পরে সোজা গেলো গণপৎকুমার লছমনগোপালের গদিতে।

নিখুঁত গদি। মস্ত বড়ো গণেশের মূর্তি কুলুঙ্গীতে, সিন্দুর-চর্চিত লোহার সিন্দুক, পুরু গদির উপরে হাতবাকসো, খেরো-বাঁধানো

হামি কুছু জানে না, সাহেব

খাতার স্তূপ, টেলিফোন, দেয়ালে—দরজায় নাগরি হরফে লেখা : লাভ, শুভ, সিদ্ধি, ঋদ্ধি।

"আসুন, আসুন।" উঠে বসলেন রামকুমার জৈন। "বসুন।"

"দামটা পেয়েছেন ?" জিজ্ঞেস করে প্রদীপ।

"হাঁ, হাঁ।"

"দামটা ঠিক আছে তো ?"

"হাঁ। ও আপনি ভাবছেন বেশি কিনা। না, ওর কমে পড়তা পড়ে না। তবে জিনিস বঢ়িয়া। আগে একটু কমই নিচ্ছিলাম। কিন্তু, দেখুন না, একগাদা টাকা গরমেণ্টের ঘরে দিতে হলো বেকসুর। সদাচার সমিতির মেম্বর নই তো। দেখুন ব্যবসায়ী তো লস দিতে পারে না। আচ্ছা, গণেশজীউ সম্পর্কে ঐ বইটার নামটা বলুন

তো? আজই খোঁজ করবো। কনজিউমার সাইকলজি বুঝতে সাহায্য করবে আমাকে।"

কুলুঙ্গীর গণেশের দিকে চাইলো প্রদীপ। হঠাৎ মনে হলো ধর্মসমাজীদের বিশ্লেষণ এবং রামকুমারের ব্যাখ্যার সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজন। জনগণেশের ঐ রকম একটি অস্ত্রই আজ দরকার বোধ হয়।

প্রতিবেশী

“আমি না থাকলে, সমঝ্ লিয়া না, ও ফ্ল্যাট আপনি পেতেন না।” গলা ফুলিয়ে বললো বচ্চন রাম।

“ঠিক বাৎ।” বললো প্রদীপ।

“জানেন, কী বেপার হয়েছিলো? গাহাক ছিলো বহুৎ। বচ্চন রাম না থাকলে, সমঝ্ লিয়া না, ও ফ্ল্যাট পেতো অন্য লোক। কেয়া রে, ছোক্‌রা, পান লাগা না চারঠো—দো হামকো, দো রায় সাহাবকো। মিঠা পাত্তি, ভুজা সুপারি, এলাইচ, লং, পিলা, মিহিন পাঁত্তি জর্দা···। হুঁ, সুনুন না বেপারটা। ম্যানেজার বললো: ও ফ্ল্যাট দো পরদীপ রায়কো; ভট্টচার্যি সাহাব ভি বললো; লেকিন

খোসলা অর তার দোস্ত্‌…। নিন, পান খান। আরে, কেয়ারে? লং কহাঁ, ভুজা সুপারি, চুনা? আমি বললাম, ও ফ্ল্যাট রায়কো দেনে হি পড়ে গা। জানেন তো, হতে পারি এক ছোটা কেয়ার-টেকর, লেকিন, জানেন তো…। পানের পিচ ফেলতে গেলো বচ্চন রাম ফুটপাতের ধারে, আর প্রদীপ ভাবতে লাগলো কখন বাড়ি যাবে। চার দফা পান খাওয়া হয়ে গেছে, এবারে পঞ্চম। আপিস ছুটির পরে দেড় ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে একই কথার পুনরাবৃত্তি—পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

"দেখুন, এ মিঃ রায়! দেখিয়ে না, সালা, সিন্ধি না পঞ্জাবী? পোষাক দেখুন! ঐ যে গাড়ি থেকে নামলো ঐ মেয়েদুটো—একে-বারে কর‍াপটেড্‌। ঢুকছে, সালা, চাং গোয়ায়। আচ্ছা, রায় সাহাব, চাং গোয়ায় সবাই ড্রিংক করতে যায়?" চবর চবর করে পান চিবোয় বচ্চন রাম।

"সবাই না।" কেমন অস্বস্তি হচ্ছে প্রদীপের, বোধহয় পানের পিচ গিলে ফেলেছে বলে।

"এ ঃ, আপনি কিছু জানে না। আমি আজ পন্দর সাল এ-পাড়ায়। ছোটো ছোটো বাঙ্গালী মেয়েরা পরিয়ন্ত ড্রিংক করে। সেদিন তো একটা ছুকরিকে বমি করতে দেখলাম। থ্‌ছু! থ্‌ছু!" পানের চর্বিত অংশ মুখ থেকে ফেলে দিলো বচ্চন রাম। "এই ছোকরা, এক গিলাস পানি, অর চারঠো পান।"

"না, রাম, আমি আর পান খাবো না। তুমি খাও। শোনো, আমি ভাবছি এই শনিবারেই চলে আসবো। ওরা পরে আসবে, টুকিটাকি কাজগুলো হয়ে গেলে। তুমি কাজকর্মগুলো একটু তদারক কোরো, কেমন? আজ চলি।"

"আরে, ঠহ্‌রিয়ে না। পান খান। অ্যায়সা পান মিলবে আপনার শ্যামবাজারে? হুঁ, ও ফ্ল্যাট আপনি পেয়েছেন, আপনার লক্‌। আরে, আরে, ইধর দেখিয়ে, রায় সাহাব, সালি কোমরের নীচে কাপড়া

পিন্‌হেছে…।” আবার পানের পিক ফেলতে গেলো বচ্চন রাম। ফিরে এসে বললো—“নিন, আপনি একেবারে চৌরঙ্গী পাড়ার সাহাব হয়ে গেলেন। তব, দেখিয়ে, আপনার শ্যামবাজারের চাল কিন্তু এখানে চলবে না। পরথম পরথম খুব অসুবিধা হোবে।”

“তোমার এখানে অসুবিধা হয় না, রাম?” জিজ্ঞেস করে প্রদীপ।

“না, আমার কেন হোবে! আজ পন্দর সাল এখানে। আমার বাড়িতে সব জাতের লোক আছে, সব আংরেজি সিসটেম। কী সব বাড়ির দেখ-ভাল আমার উপরে, কী সব জান-পেহ্‌চান্‌ আদমি আমার! অসুবিধা হোবে আপনাদের। সকল জাতের লোকেদের সঙ্গে চলে না আপনাদের, আংরেজি সিসটেমও আপনাদের না-পসন্দ্‌। দেখিয়ে না, এ-শহর, ইয়ে কলকত্তা, কাদের ছিলো। তা তারা কজন থাকে এ-পাড়ায়?…”

বাধা দিলো প্রদীপ। “রাম, এ-শহরে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে? তোমার দেশ, ছাপড়ায়?”

“হুঁ।”

“তোমার বাড়ি থেকে রেল স্টেশন কদ্দূর?’

“ছে কোস্‌?”

“আচ্ছা, ও-বাড়ির নেবাররা কেমন লোক, বলো তো?” প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় প্রদীপ।

“কোন বাড়ির?”

“যে-বাড়িতে আসছি আমি—চৌরঙ্গী কোর্ট।”

“ফাস্‌ ক্লস! ওখানে ইংলিসম্যান নেই, লেকিন চীনা আছে ছু’ঘর, গোয়া আছে, ক্রীশ্চান, পঞ্জাবী আছে, সিন্ধি আছে, গুজরাতি আছে, মাদ্রাজী আছে, আমার ইউ, পি-র লোক ভি আছে।”

“তুমি তো বিহারী!”

"ও বিহার, ইউ, পি, একই। হিন্দুস্তানী তো।" একটু হাসলো বচ্চন রাম।

"তাহলে সারে হিন্দুস্তানই ওখানে। হিন্দুস্তান কেন, চাইনীজও রয়েছে।"

"পাকিস্তানীও আছে—লিফ্‌টম্যান। নেপালী আছে-ওয়াচম্যান। একজন বর্মীও ছিলো—চলে গেছে।"

"তাহলে, বলো, গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া।" হেসে বলে প্রদীপ।

"কেয়া বোলে আপ?" ভ্রূকুটি করে বচ্চন রাম।

ঐ মেয়ে দুটো!—একেবারে করাপ্‌টেড্‌।

"আলপাইন, নেগ্রিটো, প্রোটোঅস্ট্রোলয়েড। ককেশীয়, মোঙ্গোল আর···।"

"কী বকবক করছেন, মোশাই!" কেমন হেঁয়ালি মনে হয় বচ্চন রামের।

"না, কিছু না। বলছি সারে জাহাঁর লোক রয়েছে এই কলকাতায়। আচ্ছা, রাম, আমি চলি। আর নয়।"

"ও. কে. সাব। গুড নাইট!"

"গুড নাইট।"

পার্টিশানের পর থেকে শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চলে বাস করেছে প্রদীপ, এমন কি শহরতলীতেও। সম্প্রতি বাড়িউলি হাইকোর্ট করে ওকে তুলে দেওয়ায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ও জোগাড় করলো এই চৌরঙ্গী পাড়ার ফ্ল্যাট। ছোটো, ক্লা... নেই, তবু ভালো। পাড়াটা চৌরঙ্গী। দেশ ছিলো অবিভক্ত বঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুতে। আজ ফ্ল্যাটও পাচ্ছে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে। এ-ফ্ল্যাট পাবার মূলে বড়ো সায়েবদের সহানুভূতি যেমন, কেয়ার-টেকার বচ্চন রামের চেষ্টাও অনেকখানি। বচ্চন রাম ওকে ভালো-বাসে, পছন্দ করে; বচ্চন রামকেও প্রদীপ খুব পছন্দ করে। করিতকর্মা লোক, দিল সাফ্।

"ফ্ল্যাটটা আমাকে দিন, মশাই। দ্যাট'ল্ সার্ভ অ্যাজ এ্যা জয়েন্ট অব মাই ওন। ওতে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে থ... গা পোষাবে না। ও সব ইম্পারসোন্যাল জায়গা।" বললেন ঘোষ সায়েব, "ওলি-ম্পাসের" শেষ খদ্দের যিনি।

বন্ধু শৈলজা বললে—"বাবাজী, যাচ্ছো ও পাড়ায়, ভালো কথা। তবে, সন্ধ্যেবেলা শুনবে দরজায় নক্, খুলে দেখবে টলটলায়মান কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তখন করবে কী?..." শৈলজার জন্ম বাগ-বাজারের গলিতে, এবং জন্মাবধি সেখানেই রয়েছে। "সত্যি, শৈলজা, তোমরা আর বড়ো হলে না! জ..না, ওটা রেসিডেনশ্যাল হাউস, কত্তো রেস্পেক্টেবল্ ভদ্রলোক থাকেন ওখানে।" বেশ রাগতস্বরে বলে প্রদীপ।

"রেসপেক্‌টবল্‌, মাই ফুট!" শৈলজা লেখাপড়া বেশি না শিখলে কী হবে, ইংরেজী ছবি দেখে প্রচুর, পেপারব্যাক নবেল কেনে অনেক। "যতো সব কোরাপটেড ফিরিঙ্গির আড্ডা ও সব জায়গায়। ওদের কাজ শুধু আমাদের এনজয়মেণ্ট দেওয়া।" শৈলজার মুখে আত্ম-প্রসাদের হাসি।

"ওরা কোরাপটেড, আর তোমরা ধোওয়া তুলসীপাতা!"

"আমরা ওদের ট্র্যাডিশনটা বজায় রাখছি মাত্র।" শৈলজার গলায় অসীম ঔদার্য।

"নাঃ। সত্যিই তোমরা একটা রেয়ার স্পেসিমেন, রেওয়ার শাদা বাঘের মতোই। আপশোস! তোমাদের ট্রাইবটা বড়ো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে।" শৈলজার দেওয়া পান না খেয়েই চলে এলো প্রদীপ।

কিন্তু শৈলজা-কথিত কোরাপটেড ফিরিঙ্গি পরিবেশ, ঘোষ সায়েব-কথিত নৈর্ব্যক্তিক ভাব, বচ্চন রাম-বর্ণিত আংরেজি সিসটেম নিয়ে ভাবনার কিছু না থাকলেও, চিন্তা হচ্ছে প্রদীপের একটি জিনিষ নিয়ে। প্রতিবেশী। প্রতিবেশী থাকলে ঋষির ঋষিত্ব যায়, বলেছেন সঞ্জীবচন্দ্র। কিন্তু, প্রতিবেশী ছাড়া গৃহী মানুষের চলবে কী করে! তবে, প্রতিবেশী ভালো না হলে—? বচ্চন রাম বললো, সব 'ফাস্‌ ক্লস' লোক। তাহলে আর ভাবনা কী? সাধারণ বাঙ্গালিরা অবাঙ্গালিদের চেনে না। কিন্তু, প্রদীপ তো চেনে। ওর বন্ধুদের মধ্যে অবাঙ্গালির সংখ্যাই বেশি। আর, ভগবান জানেন, ওর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই, নেই স্ত্রী অলকার মধ্যেও। ছেলে-মেয়েরা তো শিশু।

এক শনিবার বিকেলে লটবহর নিয়ে চলে এলো। বচ্চন রাম হাজির ছিলো। কুলি দিয়ে মালপত্তর চারতলায় তোলা, গোছগাছ করাতে অনেক সময় লাগলো। দারোয়ান, জমাদার, লিফ্‌ট্‌ম্যান, সবাই খুব সাহায্য করলো। কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হলো

না। শনিবার বিকেলে কেউ ঘরে থাকে না—জানালো লিফ্‌টম্যান। কেউ ছবি দেখতে যায়, কেউ বেড়াতে, আর সবাই প্রায় রাতের খাওয়াটা বাইরেই সেরে আসে।

দরজায় নক করার শব্দে ঘুম ভাঙলো পরদিন। ইস্‌, বেলা আটটা, ঘরময় রোদ্দুর। কাল রাতে চীনে দোকানে খেয়ে অনেক রাত অবধি বই পড়েছে আলো জ্বেলে। এখন কে নক করছে, বাবা! নাইট গাউন-পরা অবস্থায় দরজা খুলতেই দেখে এক মাঝ-বয়েসী ভদ্রলোক। কালো রং, মুখে মেচেতা, ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল, পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে বুশশার্ট।

"গুড মরনিং, স্যার! ইয়ু কেম লাস্ট নাইট? মিসাস এণ্ড চিলড্রেন নট কাম? আই অ্যাম ডিক্রুজ, ম্যালভিল ডিক্রুজ। লিভ অপোজিট ইয়ু। হ্যাড এ নাইস স্লীপ?" বলে আগন্তুক।

প্রথম প্রতিবেশী। ঠিক কী বলবে ঠিক করতে না পেরে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে প্রদীপ। চোখের ঘুমটা আবার তখন কাটেওনি ভালো।

"উড ইয়ু মাইণ্ড কামিং টু আওয়ার ফ্ল্যাট? জাস্ট ড্রপ ইন ওয়ান্স অ্যাণ্ড হ্যাভ টী উইট আস, প্লীজ!" সাদর আহ্বান ভদ্রলোকের।

"থ্যাংক ইয়ু।" বলে প্রদীপ। দ্রুত ওর স্মার্ট-সত্তাটা ফিরে পায় যেন। "ওক আপ জাস্ট নাউ। ইয়েট টু হ্যাভ অ্যাওয়শ। ডোণ্ট্ওয়ারি। আল মেক মাই ওন টী।"

"নো, নো, প্লীজ। মাই মিসাস ওয়জ টেলিং—ইয়ু আর অ্যালোন, নট সেটল্‌ড্‌ ইয়েট। উই আর ওয়েটিং, স্যর।" মুখভর্তি বিনয়ের হাসি ডিক্রুজের।

"ও. কে. দেন, আম কামিং ইন এ্যা কাপ্‌ল্‌ অব মিনিট্‌স্‌।" অকস্মাৎ চা খাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে ওর।

"প্লীজ ডু কাম।" চলে গেলো ডি ক্রুজ।

হাতমুখ ধুয়ে, পোষাক পরে, পায়ে চটি গলিয়ে, দরজায় তালা দিয়ে, বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো প্রদীপ। চৌরঙ্গী পাড়ায় প্রথম দিন। চতুর্দিকে ফাঁকা, বড়ো বড়ো সুন্দর বাড়ি, দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা, আলোয় আলোময়। আহ্, কী সুন্দর এ পৃথিবী! প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় প্রদীপ। তারপর, "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি" জাতীয় ভাব নিয়ে হাজির হয় ওর ঠিক সামনের ডি ক্রুজের ফ্ল্যাটে।

ডি ক্রুজেরা অপেক্ষা করেই ছিলো। ওর বৌ লিজা হাত তুলে ভারতীয় কায়দায় নমস্কার করলো, মুখে বললোঃ গুড মর্নিং! শিংগল-করা চুলে রূপালি ঝিলিক, দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। খাটো স্কার্ট, হাতে-পায়ে-বগলে বড়ো বড়ো লোম, চোখের কোণে কালি। চার-পাঁচটা কালো কালো রোগা রোগা ছেলেমেয়ে [illegible] মেলভিল ওদের সবাইয়ের পোষাকী নাম, ডাক [illegible], কে কী পড়ে, লেখাপড়ায় কে কেমন, ইত্যাদি বলবার পরে ওরা সবাই চলে গেল। না, সর্বকনিষ্ঠাটি গেলনা ; সে বায়না ধরলো কেক খাবে।

চা-খাবার খেতে খেতে অনেক কথাই হলো। মেলভিল ডি ক্রুজ কলকাতায় বাস করছে আজ প্রায় তিরিশ বছর। বাড়ি ছিলো মার্মাগাও। বাপ কাজ করতো পার্বতীপুরে সরাবজীর দোকানে। দীর্ঘকাল কাটিয়েছে উত্তরবঙ্গে। ভালো ফুটবল খেলতো ("সামাদ ওয়াজ এ পার্সোনাল ফ্রেণ্ড")। অনেক চাকরি করেছে। বর্তমানে একটা ইনজিনিয়ারিং ফার্মে ম্যানেজার। এ-বাড়ির নেবারেরা ঐ এক রকম ("অ্যাজ নেবারস্ আর")ঃ দুটো চাইনীজ পরিবারে শূয়োরের পাল ছেলেমেয়ে, তারা রোজ আট-দশটা চিকেন খায় ("খাবে না, ওদের মেইন ব্যবসাই তো স্মাগলিং"); দুটো-তিনটে পাঞ্জাবী পরিবার আছে ("হ্যাঁ, চেহারা, পোষাক, কথাবার্তায় ভালোই, তার বাইরে আর কিছু জানতে চেয়ো না"); একটা মাদ্রাজীও আছে ("ভীষণ অর্থডক্স্-ক্রীসমাসে নেমন্তন্ন করলেও

আসে না"); গুজরাটি-সিন্ধিরা আছে ওদের ব্যবসা নিয়ে ; একটা ইউ. পি. ম্যান আছে ("ভীষণ পাক্‌ড্‌ আপ")। হ্যাঁ, একজন বাঙ্গালিও আছে-হোপলেস ! বাঙ্গালিরা ঠিক এখানে থাকার উপযুক্ত নয়। সামান্য দাঁত দেখালো ডি ক্রুজ।

প্রদীপ এখন আকাশের মতোই উদার। ডি ক্রুজের ঘরটা যেন সদর স্ট্রীটের বারান্দা। সব কিছু মধুময়। খাচ্ছেও মধ্বাভাবে গুড়ের পিঠে ("এখানে না পাই ভালো চাল, না ভালো জ্যাগরি" যদিও বলেছিল লিজা)। প্রতিবেশীকে সর্বপ্রযত্নে খুশি রাখার বাসনা ওর। তাই, অনেকটা হেসে জিজ্ঞেস করে, "আমি তাহলে কী করে থাকবো এখানে ?"

"নো, নো, ইয়ু আর ডিফ্‌রেন্ট। কেয়ারটেকার বলেছে সাম। [illegible]ল কি আর তোমার বাথটব আমাকে দিতে রাজী হও। জানো তো, তোমার বাথটব আমি কালকেই নিয়ে এসেছি। কী হলো… ?"

মস্তো বড়ো একটা কাঁকড় পড়লো প্রদীপের দাঁতে, প্যানকেকের মধ্যে ছিলো।

"স্টোনচিপ, এঃ ? ডিস্ ইজ ড রাইস ইউ গেট ইন বেঙ্গল !" "ডোণ্ট ওয়ারি" একটু কাশলো প্রদীপ ; তারপর এক চুমুক চা খেয়ে বললো, "হ্যাঁ, বাথটব আমার লাগবে না। ভাঙ্গা কমোডটা পালটে ইণ্ডিয়ান স্টাইল করে নেওয়ায় বাথরুমের জায়গা কমে গেলো তো, তাই কেয়ারটেকারকে বলেছিলাম অতো বড়ো বাথটব বার করে দিতে। তা, তুমি নিয়েছো, ভালো কথা। আচ্ছা, মিঃ ডি ক্রুজ, আমি এবারে উঠবো। আমার ছেলেমেয়ের ভর্তির ব্যাপারে কোনো হেল্‌প্‌ করতে পারবে—সেণ্ট জেভিয়ার্স, লোরেটো ?"

"নিশ্চয়ই পারবো, দে আর ক্যাথলিক স্কুলস্।" বললো লিজা। "লোরেটোর মাদার আমার জানাশোনা। কবে আসছে মিসেস রায়, ছেলেমেয়েরা ?"

"ইন এ্যা উইক্স্ টাইম। গ্যাসের কানেকশন, কিচেন সিংক পালটানো, আরো দু একটা কাজ হয়ে গেলেই। কতো ছোটো জায়গা, দেখেছো তো? আচ্ছা, থ্যাংক ইয়ু মিঃ ডি ক্রুজ, থ্যাংক ইয়ু মিসিস ডি ক্রুজ, থ্যাংক ইয়ু ফর দ এক্সেলেণ্ট ব্রেকফাস্ট, থ্যাংকস্ ফর এভরিথিং।"

উড্ ইউ মাইণ্ড কামিং টু আওয়ার ফ্ল্যাট—

বারান্দায় সাক্ষাৎ এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে। ভদ্রলোক মাঝবয়েসী, ফর্সা, বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক, ডোরাকাটা পায়জামা আর হলদে পুলওভার পরা। :মহিলা, মাঝবয়েসী, বয়েসের তুলনায় চুল বেশি পাকা, মুখের তুলনায় দেহ অনেক সমর্থ, লোভনীয়ই বলা যায়।

"নমস্তে, নমস্তে। কেয়া, আপ আ গয়ে? আই অ্যাম ভাটিয়া, ইন্দর মোহন ভাটিয়া। শী ইজ মিসিস ভাটিয়া। দিস ইজ মাই ফ্ল্যাট।" এক হাত দিয়ে মিসিস এবং অপর হাত দিয়ে ফ্ল্যাট দেখাল ভাটিয়া।

"নমস্তে, নমস্তে।" হাত তুলে নমস্কার করে প্রদীপ।

"ইউ গট দিস কোয়ার্টার ফ্রম অফিস?" জিজ্ঞেস করেন ভাটিয়া।

"না, কোয়ার্টারস নয়, বাড়ি ভাড়া নিলাম।" জবাব দেয় প্রদীপ।

"ও। আমি ভাবলাম তোমার অফিস বুঝি তোমায় কোয়ার্টার দিল। ইউ আর মিঃ—"

"রায়। প্রদীপ রায়।" অকারণে পুলকিত ও।

"কেয়া, আপকে ফ্যাম্‌লি নেই আয়ে?" জিজ্ঞেস করেন মিসিস।

"শীগগিরই আসছে।"

"বেরি গুড! তা, শুনলাম আপনার বাথটব আপনি বার করে দিচ্ছেন। ওটা আমাদের দিন না? বড়ো অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। জেরা মেহেরবানি করকে—।"

"দেখুন, ওটা মিঃ ডি ক্রুজ অলরেডি নিয়ে গিয়েছেন।" বলে প্রদীপ, মুখভর্তি হাসি ওর।

"বাট হি হ্যাজ টেকন ইট বিদাউট ইওর পারমিশন।" ভদ্রমহিলা পঞ্চনদীয় ইংরেজী ভালোই বলেন। "বাট আই অ্যাপ্রুভড্ হিজ অ্যাকশন এ লিটল হোয়াইল এগো।" "স্টিল ইয়ু ক্যান টেক ইট ব্যাক।" পঞ্জাবিনী সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। "পসিব্‌লি নট। আমি খুব দুঃখিত আপনার দরকারটা আগে জানা ছিল না।" মুখে হাসি লেগেই আছে, দ্রুত নমস্কার করে চলে আসে প্রদীপ নিজের ফ্ল্যাটে। ওপরে তাকিয়ে দেখে মানসুখানির বুড়ি বৌ আর গোটা-কতো মোটাসোটা মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

খাটে এসে ধপ্ করে শুয়ে পড়ে প্রদীপ। যাক, এতোদিনে একটা মনের মতো ফ্ল্যাট পাওয়া গেলো। একেই বলে অ্যাপার্টমেন্ট। বাগবাজারের ও-বাড়িকেও ব্যাটাচ্ছেলে বাড়িউলির জামাই বলতো ফ্ল্যাট। হুঁঃ! কংক্রীটের তৈরী মস্ত বাড়ি, টানা করিডোর, বড়ো বড়ো ঘর, মস্ত মস্ত জানলা-দরজা, দিবা-রাত্র লিফ্‌ট্ চলছে, চব্বিশ ঘণ্টা রানিং ওয়াটার, শাওয়ার, কিচেন সিংক, পাইপলাইন গ্যাস, আলাদা ইউনিট। গলি নেই, ডাস্টবিন নেই, রক নেই, আড্ডা নেই। এ-বাড়ির ভাবটাও দেখা যাচ্ছে মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, লোকজনও মনে হচ্ছে মধ্যবিত্ত মানসিকতাওলা। দোতলার বঙ্গ-সন্তানটি মনে হয় প্রচণ্ড উন্নাসিক—আমাদের দেশোয়ালিদের যা দস্তুর। প্রদীপদের কাছে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনের মিলটাই আসল। আর বেশি ঘনিষ্ঠতার দরকারই-বা কী? এখানে কেউ জিজ্ঞেস করবে না কী দিয়ে ভাত খেলো, কেমন করে রোজ মাছ-টাছ খাচ্ছে। পঞ্জাবী-সিন্ধিরা কোরাপটেড। বচ্চন রামের কথায় হাসি পেলো ওর। শৈলজা কলকাতার শিক্ষিত ভদ্র সন্তান হয়েই যদি ঐ-ধারণা করে তাহলে ছাপরার বচ্চন রাম কী দোষ করলো!

শীতকাল, তবু অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারে চান করে, পোষাক পরে, তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো কোনো হোটেলে খেতে। রোববারের দুপুর বেলার চৌরঙ্গী, কেমন ফাঁকা ফাঁকা। আধমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সব জায়গা ঢুঁড়েও দুটো মাছের ঝোল-ভাত পেলো না। ফরাসী রান্না, মোগলাই খানা, অত্যুত্তম চাইনীজ ডিশ, সব পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়জন যাহে ব্রহ্মস্বাদ অনুভব করে সেই মাছের ঝোল ভাত পেতে যেতে হলো মাইল খানেক উজিয়ে বৌ-বাজারের নোংরা হোটেলে।

বিকেলে এলো বচ্চন রাম। "কা, রায় সাহাব! কেমন লাগছে সাহেবপাড়া? ঘুম হয়েছিলো তো? দাঁড়ান, দেখি, আগে লিফট-ম্যানকে পান আনতে বলি।"

ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলো বচ্চন রাম। "আর একটু জায়গার দরকার আপনার। দেখা যাক।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রদীপ বলে "দেখো, রাম, আমার বারান্দায় পাশের ফ্ল্যাটের চীনেরা কী রকম জঞ্জাল রেখেছে। মুরগীর খাঁচা, আরো কত কী! ওগুলো সরানো যায় না? জায়গাটা দেখতে খারাপ হয়েছে, আর তাছাড়া আমার তো জায়গার দরকারও। আমি আমার দু চারটে জিনিস রাখতে পারি ওখানে।"

. "ঠিক, ঠিক!" বলে বচ্চন রাম। "বেপার হলো কী, অনেকদিন আপনার এই ফ্ল্যাট তালা বন্ধ ছিলো তো, তাই, ওরা এসব বেবহার করছে। দাঁড়ান, জমাদার ডেকে এক্ষুনি সরিয়ে দিচ্ছি।"

জমাদারকে জঞ্জালগুলো সরিয়ে দিতে বলায় সে চোখ বড়ো করে বলেঃ ওসব তো চীনাকা চীজ। "আরে হঠা দো!" বচ্চন রামের পরুষ আদেশ। একটুখানি সরিয়ে দিলো জমাদার। "অর থোড়া হঠা দো।" বলে প্রদীপ। নড়ে না জমাদার। প্রদীপ তাকায় বচ্চন রামের দিকে। "কিৎনা প্যয়সা মিলতা চীনাসে?" চিৎকার করে ওঠে বচ্চন রাম। সুর সুর করে একেবারে সব জিনিস চীনেদের ফ্ল্যাটের কোনে ঠেলে দেয় জমাদার। ওরা ঘরে এসে বসে।

"দেখো, রাম," বলে প্রদীপ, "সরিয়ে তো দেওয়া হলো। এনিয়ে আবার কোনো হুজ্জুত না করে ওরা।"

"আরো, এ কি আপনার শামবাজার পেয়েছেন!" ধমকের সুরে বলে বচ্চন রাম। "ঐসা আদমি নয় এখানে। ভয় খাচ্ছেন কেন?"

"ভয় নয়। পড়োশীর সঙ্গে বিবাদ চাই নে।"

"সেটা ঠিক আছে।"

বার চারেক পান খেয়ে উঠলো বচ্চন রাম। প্রদীপও ওর সঙ্গে বেরুবে বলে লিফটের মুখে থামতেই দেখা মিঃ খান্নার সঙ্গে। বয়স্ক,

রাশভারি লোক। বচ্চন রামই বলেছিল কোথায় যেন বেশ বড়ো চাকরি করেন ভদ্রলোক।

"নমস্তে, খান্না সাহাব। মিলিয়ে ইন্‌সে, আপকে পড়োশী, মিঃ রায়। আমাদের আপিসের লোক।"

"নমস্তে। প্লীজ্‌ড্‌ টু মীট ইয়ু।" হাত বাড়িয়ে দেন খান্না। "ইউ আর আওয়ার ল্যাণ্ডলর্ড। ইউ আর সিংগল্‌?"

"না। আমার ফ্যামিলি আসছে শীগগিরই।"

"আপনি ভাগ্যবান—এ-বাজারে এমন একটি ফ্ল্যাট পাওয়া। কোথায় ছিলেন আগে—বালিগঞ্জ?"

"না, শ্যামবাজার, ঐ ফাইব পয়েণ্ট ক্রসিং-এর কাছে।"

জায়গাটা মিঃ খান্না চিনলেন বলে মনে হলো না। বললেন, "কলকাতার কতোটুকুই বা চিনি! বাড়ি, অফিস, ক্লাব, আর চৌরঙ্গী -আলিপুরের কিছু আত্মীয়-বাড়ি। ভেরি গুড, আপনি এলেন। আমি এবং মিসিস খান্না বাঙ্গালী কালচারের বড়ো অ্যাডমায়ারার। আচ্ছা, পরে কথা হবে।" নড করে চলে গেলেন খান্না।

"মিঃ শ্রীবাস্তব নেই। আপনার সে বিসোয়াসের ফ্ল্যাটও বন্ধ। ওরা প্রায়ই থাকে না, থাকলেও মেশে না। তাহলেও বলছি, রায় সাহাব, আপনার নেবররা প্রায় সকলেই ভালো লোক। থাকলেই বুঝবেন। নিয়ে আসুন ওদের তাড়াতাড়ি। পূজা-উজা দিন, আমরা প্রসাদ-উসাদ পাই।" হাসলো বচ্চন রাম।

"হবে। হবে।" হাসলো প্রদীপও।

পরের সপ্তাহে ঢাকুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে অলকা আর ছেলে-মেয়েরা এলো। এ-ক'দিনের মধ্যে আর কারো সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়নি, তবে খান্না, ভাটিয়া, ডি ক্রুজের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিছু কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। আলাপের বেশির ভাগই কলকাতার সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং প্রথা, ভারত সরকারের

পররাষ্ট্র নীতি, ইত্যাদি নিয়ে। মতে না মিললেও তর্ক করেনি প্রদীপ। ওটা, ওর মনে হয়েছে, ব্যাড ম্যানার্স।

রাতের খাওয়া সেরে এসেছিলো ওরা। ছেলেমেয়েরা ট্যাক-সিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফ্ল্যাটে এসে ওদের শুইয়ে দিয়ে ওরা নিজেরাও শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগলো। আজ যেন ওদের দ্বিতীয় ফুলশয্যা—যেন আবার নতুন জীবনের সূত্রপাত।

নতুন জীবনই মনে হলো অলকার পরদিন থেকে। সব কিছুই নতুন ধরণের। ধোঁওয়া নেই, জলের কষ্ট নেই, মশামাছি নেই। আয়া সকালবেলা থেকেই কাজে বহাল হলো। অলকার জামাই-বাবু দানাপুর থেকে অনেক সুন্দর, সুগোল কপি এনেছিলেন। তার কতকগুলো, আর ঢাকুরেয় তৈরী করা কিছু ক্ষীরের তক্তি, নারকেলের ছাঁচ, সব আয়ার মারফৎ ঘরে ঘরে পাঠালো অলকা—ডি ক্রুজ, খান্না, ভাটিয়া, ওপরের মানসুখানি, তলার এবং পাশের দুই চীনের ঘরে, গুজরাতি, মাদ্রাজী, আর শ্রীবাস্তবের ঘরেও। একটু বাদেই সুরু হলো ধন্যবাদের পালা। নীচের শ্রীবাস্তবের ঘর ছাড়া আর সব ঘর থেকেই এ:কে একে সবাই-সস্ত্রীক ডি ক্রুজ, খান্না, ভাটিয়া, মানসুখানির বৃদ্ধা স্ত্রী, গুজরাতি ভদ্রলোক স্বয়ং, চীনে ছেলেমেয়েরা, খানিক বাদে মিঃ সুব্রামনিয়ম পর্যন্ত। সুব্রামনিয়ম জিজ্ঞেস করলেন প্রদীপকে ওরা ব্রাহ্মণ কিনা। 'হ্যাঁ' বলায় বললেন, আই থট অ্যাজ মাচ। অলকার খুশি আর ধরে না।

সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরে শুনলো প্রতিবেশী-প্রশস্তি। শুধু অলকার কাছে নয়, ছেলেমেয়েদের কাছেও। সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সব ঘর থেকেই টফি-চকলেট-লোজেঞ্জ দিয়েছে ছেলেমেয়েদের। মিসেস মানসুখানি বলেছেন, বেহ্নজী, তোমার ফ্ল্যাট ছোটো, রোজ বিকেলবেলায় উপরে চলে আসবে, আমরা ছাতে বসবো। মিসেস খান্না বলেছেন, মিস্টার খুব বাঙালী মছলি রান্না পছন্দ করে, রেঁধে খাওয়াতে হবে। মিসেস ভাটিয়া প্রসাদ

ফিরে গেলেন। সুন্দর লোক সব—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে অলকা। সবাই মোটামুটি অবস্থাপন্ন, কিন্তু এতোটুকু দেমাক নেই। নীচের ঐ বাঙালি বিশ্বাসের কথাও শোনা গেছে। ওরা থাকে না বেশি, আর থাকলেও মেশে না বিশেষ। বড্ডো নাকউঁচু।

"আচ্ছা, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফিকালটি হলো না তোমার?" জিজ্ঞেস করে প্রদীপ।

"না:। ইংরেজীটা দেখলাম মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারি, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিও। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এরাও অনেকে বাংলা বোঝে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতেও পারে কেউ কেউ, মিসেস খান্না বললেন, 'এ বাড়িতে একটা খাঁটি বাঙালী পরিবার—বাঙালি মেয়েই—আমরা চাইছিলাম। এমন জায়গায় থাকি যে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ হওয়াই মুশকিল।' খুব খুশি হয়েছেন আমাকে পেয়ে। সকলের আমি বেহ্‌নজী, বাচ্চাদের আন্টি।" অলকার খুশি আর ধরে না।

"চীনেদের সঙ্গে আলাপ হলো?"

"ওদের স্বামী-স্ত্রীরা তো সারাদিন দোকানেই থাকে। দুজনের দুটো খুব বনেদী জুতোর দোকান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বাচ্চারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বলে। সি ময় আর মিন্ চু তো সারাদিন প্রায় আমার ঘরেই ছিলো। মেয়েদের চুল অবধি আঁচড়ে দিলো। আমাকে রোগা দেখে বললো, 'আন্টি মুল্‌গী, খাও, তবিয়ৎ আচ্ছা হো জায়েগা।' হিঃ হিঃ! তবে, একটা ব্যাপার," একটু গম্ভীর হয়ে বলে অলকা, "ওরা মাও-ৎসে-তুংয়ের নাম শুনে থুথু ফেলে। সব চ্যাং কাইশেকের ভক্ত!"

অলকা নয়া গণতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিশ্বাসী।

"শোনো," বলে অলকা, "আগামী সোমবার তো সরস্বতী পুজো। ভালো করে করতে হবে। আমি প্রসাদ পাঠাবো সবাইকে। একবার খিচুড়ী খেয়ে কী বলে দেখি সব!"

"হ্যাঁ, করতে হবে পুজো। বচ্চন রামও বলেছে পুজোর কথা। ঐ একসঙ্গেই সেরে দেবো।" আনন্দকে হিসেবের সঙ্গে পান্‌চ্‌ করলো প্রদীপ।

প্রদীপের ফ্ল্যাটের ক্ষুদে সরস্বতী পুজো আন্তর্জাতিক রূপ পেলো। ফুল নিয়ে অঞ্জলি দিলো সবাই—এক ডি ক্রুজেরা ছাড়া। ওরা গোঁড়া ক্যাথলিক। অলকার মুখে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথায় চমকে উঠেছে লিজা, বলেছে পোপের স্যাংশান নেই। চীনে ছেলেমেয়েদের অঞ্জলি দেওয়া দেখে প্রদীপের মনে পড়লো সুনীতি চাটুজ্যে মশাইয়ের লেখা সেই চীনেদের 'খোতাখল'। মনে মনে একচোট হাসলো ও।

মাই কংয়ের মালিকের সঙ্গে লিফটে দেখা হলো একদিন। ওর নাম জানা নেই—দোকানের নামে সবাই ওকে মাই কং বলেই ডাকে। দেখে বোঝা যায় না কতো বয়েস। কী দামি পোষাক পরনে। চীনে ছেলেমেয়েরাও সব বিলিতি প্রিন্টের পোষাক পরে। পরবে না, ওদের সঙ্গে যে হংকংয়ের খুব যোগাযোগ! হাত তুলে বললো: সেলাম! মুখের কোনো ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না, শুধু দুই ঠোঁটের ফাঁকে সোনালি দাঁত একটু ঝিলিক দিয়ে গেলো। প্রদীপ হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে বলে—"আপনার দোকান তো খুব পুরোনো।" পরিষ্কার বাংলায় জবাব পেলো, 'সিক্‌স্‌টি ফাইব ইয়ার হয়ে গেলো।" "আপনি সারাদিন দোকানেই থাকেন," এ প্রশ্নের জবাবে আবার সেই দাঁতের ফাঁকে সোনালি ঝিলিক।

কদিন বাদে ছেলে বললো—"বাবা, আমরা ক্লাব করেছি—ইন্টরন্যাশনাল ক্লাব। বাইশজন মেম্বর। আমি, মিলি, চন্দনা ছাড়া জনেরা চার ভাই-বোন, তৃপ্তারা তিন বোন, রাকেশেরা দুই ভাই, পুষ্পা আর জয়া দুই বোন ও শ্রীধরন, সি ময়, মিন্‌ চু, আহ্‌ হং, আহ্‌ লীরা সাতজন। শুধু নরিন্দর আর মুন্নি বাদ। ওরা বড়ো হয়ে গেছে।"

"মিঃ শ্রীবাস্তবের ছেলে নেই তোমাদের সঙ্গে ?"

"না, ও কারো সঙ্গে মেশে না। ওর বাবা-মার সঙ্গেই থাকে সব সময়। বাবা, জন বলেছে আমাকে সেণ্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হতে। মিলি আর চন্দনা তো লোরেটোয় ভর্তি হচ্ছেই। ডি ক্রুজ আন্টি ব্যবস্থা করছে। আর জানো, মিলি এরই মধ্যে কেমন ইংরেজী বলছে। চন্দনাও হিন্দি বলছে ওদের সঙ্গে। আমিও বলছি ছুটোই। জানলে, অল্প কদিনেই আমরা খুব ভালো বলতে পারবো। বাবা, আমাকে সেণ্ট জেভিয়ার্সে দেবে ?"

"দেখি। এখন মাকে বলো খেতে দিতে।"

খেতে বসে অলকা বলে, "জানো, আমি আজ কিছুই রান্না করিনি। নানান ঘর থেকে সব খাবার এসেছে। এটা হলো সবুদ মুং ডাল, মিসিস খান্না পাঠিয়েছেন। এই করলাভাজাগুলোও। দেখো, ভেতরে কেমন বাদাম দেওয়া। মিসিস মানসুখানি পাঠিয়েছেন এই হিংয়ের পাঁপড়। রুটিগুলো মিসিস ভাটিয়া। উনি আমাকে গ্যাসের উনুনে রুটি করা শিখিয়েছেন। ঐ মাছেব তরকারিটা দিয়েছেন মিসিস ডি ক্রুজ—নারকেল দিয়ে পমফ্রেট মাছ। মিনচু অনেক মাছের পাঁপড় পাঠিয়েছিলো—ছেলেমেয়েরা সব খেয়ে ফেলেছে।" ।মিন

"বাঃ বাঃ বাঃ! রোজ এ রকম হলে মন্দ হয় না। তা, তুমি এক কাজ করো। ফ্রায়েড রাইস—চাইনীজ স্টাইল-করা শিখে নাও।" হিংয়ের পাঁপড় খেতে খেতে বলে প্রদীপ।

"সে আর বলতে হবে না, মশাই। মিন্ চুর দিদি আসবে কাল। সে শিখিয়ে দেবে। এদিকে কী হয়েছে জানো ? আমার পাঠানো মাছের তরকারি খেয়ে মিঃ খান্না বলেছেন তাঁর মিসিসকে—সিখ্‌লো মছলি পকানা। মিসিস খান্না বললেন, 'বেহনজী, তোমার জন্যে ডিভোর্স হয়ে যাবে আমাদের।' ওদিকে মিঃ ডি ক্রুজ তার মিসিসকে বলেছিলো—'খেও না বেঙ্গলি কারি—ঝাল।' মিসিস তো খেয়ে

আত্মহারা। বললো, 'মিঃ ডি ক্রুজ টেস্ট বোঝেনা।' নাও ঠ্যালা। হিঃ হিঃ হিঃ। যাই বলো, লোক ওরা সবাই ভালো। সবচেয়ে ভালো মনে হয় লিজা। ভারি সরল মানুষ। না, বাপু, তোমার বদলি হলেও আমি এখান থেকে যাচ্ছিনে।"

প্রদীপ তৃপ্ত। বিয়ের পরে এতো হাসিখুশি অলকাকে সে কখনও দেখেনি।

"কালকে একটু সকাল করে ফিরো তো।" বলে অলকা। "ওদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে-হিন্দি। তারপর একদিন ওঁদের নিয়ে যেতে হবে বাংলা ছবিতে। মিসিস মানসুখানি কথা কম বলেন, কিন্তু কীর্তনের ভারি ভক্ত। ভারি ভালো মানুষ।"

"ওঁর মেয়েগুলো কেমন? ওদের পোষাক-আশাক, বাপু, আমার ভালো লাগে না মোটেই।"

"পোষাক ও রকম হলে হবে কী, বেচাল নেই মোটেই। একটা ছোকরাও আড্ডা দিতে আসে না। তোমার বাঙ্গালী বাড়ি হলে—? না, ওরাও ভালো।"

প্রতিবেশী-সংক্রান্ত কাল্পনিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হলো। আর চিন্তা নেই। ঘোষ সায়েব মরুক গে, শৈলদাকে এনে দেখাতে পারলে হতো একদিন। কী বলেছিলো ওকে সেদিন—রেওয়ার সাদা বাঘ? মনে মনে একচোট হাসলো প্রদীপ।

রাতে শুয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো অলকা—"একটা জিনিস দেখেছো এখানে? নোংরা কথা, খিস্তি-খেউড়, একদম নেই। বাগবাজারে কী সব বিচ্ছিরি কথা বলতো আশপাশের ছেলেমেয়েরা। দোতলার বৌ তো মুখ খুলেই থাকতো। "না, ওসব এখানে পাবে না। তবে, তুমি কিছু কোংকনি আর চীনে খিস্তি শিখে নিও। আমি ওদুটো জানিনে। হিন্দি-উর্দু-পঞ্জাবী জানি।" "অসভ্য!"

কোনখান দিয়ে একটা মাস কেটে গেলো তরতরিয়ে। সেদিন বচ্চন রাম দেশে যাবে। তার সঙ্গে, তারই ট্যাকসিতে হাওড়া স্টেশনে গেলো প্রদীপ। বচ্চন রামের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। এ-ফ্ল্যাট পাবার মূলে ওর অবদান অনেকখানি। হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরতে বেশ দেরি হলো—ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথার গ্লোবটা নিভে গেছে তখন।

ভীষণ থমথমে মুখ অলকার। এতো অসুখী দেখাচ্ছে কেন ওকে? দেরি করে ফেরবার জন্যে, নাকি শাশুড়ীর কিছু হলো? হাই ব্লাডপ্রেশারের রুগী।

"কী হলো, খবর কী? মা কেমন আছেন?" প্রদীপ দারুণ উদ্‌বিগ্ন।

জবাব দেয়না অলকা। নিঃশব্দে খাবারের টেবিল সাজায়।

জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, খেতে বসতেই অলকার সমস্ত দুঃখের, সকল ক্ষোভের বাষ্প গলে পড়লো জল হয়ে।

"কী সব লোক, এঁ্যা! নতুন বলেও কোনো চক্ষুলজ্জা নেই! অমন যে অশিক্ষিত, অসভ্য পরিবেশ বাগবাজারের সেখানেও তো এমন দেখিনি? উঃ! ভাবতেও পারছিনে আমি। ছি ছি ছি ছি ছি!"

প্রদীপ বজ্রাহত! সে কি! কী হলো?

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে দেরী হলো না। অলকাই জানালো। আজ বিকেলবেলায় সর্বজন-সমক্ষে সামনের ফ্ল্যাটের লিজা ডি ক্রুজ বেশ চেঁচিয়ে বলেছে তার ছোটো ছেলে আর মেয়েকে নাকি মেরেছে অলকার ছেলেমেয়ে। এবং এ মারাটা নাকি এই প্রথম নয়। ভদ্রতার খাতিরে, নতুনত্বের খাতিরে, আগের অপরাধগুলো অগ্রাহ্য করেছে লিজা। অলকা বলতে গিয়েছিলো গোটা ব্যাপারটা ঠিকমতো অনুধাবন না করেই বোধহয় মিসেস ডি ক্রুজ একতরফা দোষারোপ করছেন। লিজা নাকি তার উত্তরে চিৎকার করে বলেছে

সে তার ছেলেমেয়েদের ভালো করেই চেনে। আর স্থানীয় লোকে-দেরও—যা বলতে সে অলকাদেরই বুঝিয়েছে—সে ভাল করেই জানে। শেষের কথাটি সে হিন্দিতে, 'তুমি' সম্বোধন করে বলেছে। আর কথা বাড়ায়নি অলকা।

ভীষণ খারাপ লাগে প্রদীপেরও। তার ছেলেমেয়েদেরও সে ভালো করেই চেনে। তবু, জিজ্ঞেস করলো, "ছেলেমেয়েরা কী বলে?"

"ছেলেমেয়েরা বললো, টম আর টোটো নাকি কারণে-অকারণে চিমটি কাটে ওদের। ওরা কিছু বলে না। আজকে শুধু চিমটি কাটা নয়, থুথুও দিয়েছে গায়ে, তাই, ওরা আর সহ্য না করে ধাক্কা দিয়েছে ওদের, আর তাইতে ওরা পড়ে গেছে। টম নাকি ড্যাডি-মামি নিয়েও কী সব কথা বলেছে। ওদের ভালো লাগে নি সে সব।" জানায় অলকা।

চেপে যাও ওসব। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে বড়োরা না যাওয়াই ভালো। কিছুদিন ওরা না হয় ডি ক্রুজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করুক—অন্যেরা রয়েছে তো। এ সব একটু আধটু হয়েই থাকে।" মনের অস্বস্তিটা চাপা দেবার চেষ্টা করে প্রদীপ।

"শোনোই না সবটা। এখনও শেষ হয় নি।" বলে অলকা। "সন্ধ্যের মুখে আজকাল রোজই যাই তো মানসুখানির ছাতে—সিঁড়ির মাথায় ঐ ফালিটায় গিয়ে বসি। আজও যথারীতি সেখানে যাচ্ছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই শুনতে পেলাম লিজার গলা—যে-লিজা কোনোদিনই ও-দলে থাকে না। লিজা বলছে, আমার হাজব্যাণ্ড তখনই কেয়ার-টেকারকে বলেছিলো এসব লোক ঢুকিও না এ-বাড়িতে—দে আর ইয়েট টু কাম আপ টু দ স্ট্যাণ্ডার্ড। ...সিঁড়িতে পা দুটো যেন এঁটে গেলো আমার। মিসিস ভাটিয়া কী বললো, জানো? বললো, সামান্য একটা বাথটাব দিতে

পারলো না আমায়—সো মীন। মিসিস খান্না গম্ভীর গলায় বললো : আদৎ খরাব। মিস্নিস মানসুখানি বললো—উও ছোকরাকা চাল অচ্ছা নহী। যখন তখন আমার বড়ো বড়ো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসে। হ্যাঁ, গা, সত্যি তুমি তাই করো নাকি? মানসুখানির

মানসুখানির ধুমসী মেয়েটা বললো 'এরা নিতান্ত গরীব।'

ধুমসী মেয়েটা বললো—'এরা নিতান্ত গরীব। না আছে ফ্রীজ, না আছে রেডিওগ্রাম, এমন কি একটা সোফা-সেটও নেই। আছে কিছু কিতাব। চাইলাম সেদিন 'সন্স্ এণ্ড লওয়ার্স' ; দেবার আগে রায়ানির কতো কৈফৎ : কী কী বই পড়েছি, লরেন্স পড়ে বুঝতে পারবো কি না···। আনকলচর্ড···!' মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে

লাগলো আমার—পালিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েদের বারণ করে দিয়েছি মিশতে। কিন্তু, এ-ভাবে কি বাস করা যাবে ?" ভীষণ শক্ত মেয়ে অলকা, তবু কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

এক মুহূর্তে তেতো হয়ে গেলো সব। হনিমুনের শেষ দিনটাতেই যেন ডিভোর্স। জোর করে বললো, "দেখো, থাকতে হবেই। কিছুদিন মেলামেশাটা কম করো। আমাদেরই ভুল হয়েছে—ফেমিলিয়ারিটি ব্রীড্স্ কনটেমপ্ট। ওদের বুঝতে দাও আমরা আহত। বরং চীনেদের সঙ্গে বেশি করে মেশো। ওদের এসব ঝামেলা নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের মিলও যথেষ্ট। তারপর, তলার ঐ বিশ্বাস এলে ওদের সঙ্গেও যোগাযোগ করো। এসব তো একটু আধটু হবেই। ঋষির ঋষিত্ব যায় প্রতিবেশীর জন্যে—আমরা তো সাধারণ মানুষ।" সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি মানসিক অনুকম্পাটাকে আবার শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত করলো প্রদীপ। খেয়ে উঠে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ "প্যারাডাইজ লস্ট" পড়লো।

পরদিন শনিবার। আপিস ছুটির পর ওরা সবাই চলে গেলো ঢাকুরেয়। সোমবার ছুটি ছিলো, অতএব, মঙ্গলবার ফিরে এলেই হবে। আয়াকে বলে গেলো দুধটা যেন মিল্ক্ ডিপোতেই সারেন-ডার করে দেয়।

ঢাকুরেয় প্রচণ্ড মশা, জলের অভাব, উনুনের ধোঁওয়ায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন, পচা ড্রেন, নোংরা—তবু বেশ কেটে গেলো দুটো দিন খেয়ে, আড্ডা মেরে, তাস খেলে, ঘুমিয়ে। মঙ্গলবার সকালে ওরা ফিরে এলো। বাড়ির গেটেই দেখা আয়ার সঙ্গে, দুধ নিয়ে ফিরছে।

"কেয়া, আয়া, দো রোজকা দুধ কেয়া হুয়া ?"

"মেমসাব লিয়া, ডি কুরু মেমসাব।..."

অলকার মুখে চেয়ে হাসলো প্রদীপ। অলকা হাসলো না।

মাই কংয়ের মালিক বেরিয়ে যাচ্ছে দোকানে। ঠিক আগের

মতো হাত তুলে বললো—ছেলাম। সোনালি ঝিলিক দেখা দিলো ঠোঁটের ফাঁকে।

"বেশ লোকটি, না?" বলে প্রদীপ।

"বোঝা ভার। মুখ দেখে ওদের ভাব বুঝবে কে?" বলে অলকা।

লিফ্‌টে করে উঠতে দেখে তিনতলায় বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। "ঐ তো, এসে গেছেন মিঃ বিশ্বাস। আজই গিয়ে আলাপ করবে। বেরাদরিটা ঝালিয়ে নেবে।" খুশি দেখায় প্রদীপকে।

ফ্ল্যাটের কাছে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ! ওমা, এ কী! প্রদীপের আর তার পাশের মাই কংয়ের ফ্ল্যাটের সামনের জায়গাটা জুড়ে রাজ্যের জিনিসপত্র। গোটা পাঁচ-ছয় মুরগীর খাঁচাই নয়, পাঁচ-সাতটা কাঠের বাক্‌সো, টুকরো টুকরো চামড়া, একটা জুতো সেলাইয়ের কল পর্যন্ত। তাজ্জব ব্যাপার! মাই কং বা তার ছেলে-মেয়েরা কোনো আভাসও তো দেয়নি কোনো সময়ে!

মাই কংয়ের দরজায় নক করলো প্রদীপ। সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুললো এক বুড়ি—মাই কংয়ের শাশুড়ী বোধহয়। সমস্ত মুখের চামড়ায় ভাঁজ, ভাবলেশহীন মুখ। হাত দিয়ে জঞ্জালগুলো দেখালো প্রদীপ, মুখে জিজ্ঞেস করলো—ই সব কেয়া? মুখের সব কটা সোনা বাঁধানো দাঁত দেখালো বুড়ি, তারপর নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে আবার বাইরে গেলো প্রদীপ। দেখে বেরিয়ে ফিরছেন মিঃ খান্না। দ্রুতপায়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললো—"গুড মর্নিং, মিঃ খান্না। দেখেছেন মাই কংয়ের কাণ্ড? করিডোরে কী করেছে! আমাকে জব্দ করতে চায়, কেমন?"

"বাট দে আর গুড পিপল্‌, এ হ্যাপি লট। কারো সঙ্গে তো গোলমাল করে না ওরা। এক্‌স্‌কিউজ মি।" চলে গেলেন খান্না।

আরো কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো প্রদীপ। কারো

দেখা নেই। উপরে তাকিয়ে দেখে মানসুখানির ধুমসী মেয়েটা স্লিপিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে ওরই দিকে চেয়ে। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিলো প্রদীপ। ফিরে এলো নিজের ফ্ল্যাটে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগটা নিয়ে বাজারের পথে পা বাড়ালো প্রদীপ। স্যর আশুতোষের স্ট্যাচুর সামনে দেখা মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে। ব্যবসায়ী মানুষ, ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ই না প্রায়।

"নমস্তে, প্যাটেল সাহাব। দেখেছেন মাই কংয়ের কাণ্ড। আমার করিডোর কেমন জুড়ে বসেছে।"

"মাই কং খুব ভালো লোক, রায় মহাশয়। ও কারো সঙ্গে গোলমাল করে না। বনেদী ব্যবসায়ী। দেখছি তো এতোদিন ওকে। আচ্ছা, নমস্তে।"

ধর্মতলার মোড়ে দেখা ভাটিয়া আর ডি ক্রুজের সঙ্গে। ওরা বাজার করে ফিরছে। উইশ করে বলে প্রদীপ—"চাইনীজরা কী কাণ্ড করেছে, দেখেছেন? করিডোরের সব জায়গাটা ওদের নোংরা জিনিসে ভর্তি করেছে। হাউ ফানি! হাউ আনজাস্ট! হেল্প্ মি, প্লীজ, উইল ইয়্যু?"

"তোমাদের ঝগড়ায় আমাদের জড়াচ্ছো কেন?" নিরুত্তাপ গলায় বললো ভাটিয়া। "গুড নেবারলিনেস ইজ এ রেয়ার ভার্চু"। টিপ্পনি কাটলো ডি ক্রুজ। তারপর বললো, "ইউ হ্যাড বেটার কনসাল্ট বিসোয়াস। হি হ্যাজ কাম।"

রী রী করতে লাগলো গা। কথা না বাড়িয়ে বাজারের পথে পা বাড়ালো।

বাড়ি ফিরে দেখে হুলুস্থুল কাণ্ড সমস্ত ফ্ল্যাটের প্রায় সব লোক উপরে, নীচে, ওদের ফ্লোরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কী ব্যাপার? না, জমাদার আসতেই অলকা তাকে দিয়ে মাই কংয়ের জিনিসগুলো একটু সরিয়ে দিচ্ছিলো। আর যাবে কোথায়?

দুই চীনের প্রায় গোটা কুড়ি ছেলেমেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে, যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছে চিৎকার করে,—অতি জঘন্য হিন্দি খিস্তি সব। তারপর নীচের ঐ বিশ্বাস ভদ্রলোক উপরে উঠে এসেছেন, মাই কংয়ের চাকরকে দিয়ে প্রতিটি জিনিস আগের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন, চীনে ছেলেমেয়েদের বলেছেন অসুবিধে হলে তাঁকে খবর দিতে, বাইরে থেকে শুনিয়ে গেছেন—মাই কং তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু; তার কোনো অসুবিধে তিনি বরদাস্ত করবেন না।

আগুন চেপে গেলো মাথায়। নর্মান অত্যাচারে কোনো কোনো স্যাক্সন মোড়লের যেমন চাপতো, পর্তুগীজ হারমাদদের অত্যাচার শুনে কোনো কোনো পূর্ববঙ্গীয় ভূস্বামীর যেমন চাপতো। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো প্রদীপ তিনতলায়, গেলো বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের সামনে। জোরে বার দুয়েক কলিং বেল টিপতেই খুলে গেলো দরজা। চোমরাও গোঁফ, ডোরাকাটা পায়জামা-পরা একটি বিশাল, গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক।

"ইয়েস ?" রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করে বিশ্বাস।

শরীর কাঁপছে, তবু যথা সম্ভব নিজেকে সংযত করে বলে প্রদীপ "আমি রায়, প্রদীপ রায়। এ বাড়িতে নতুন এসেছি। দুঃখের বিষয় এ-ভাবে আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে হচ্ছে। শুনলুম আপনি নাকি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমার বারান্দাটা মাই কংয়ের দখলে আনতে সাহায্য করেছেন। ব্যাপারটা খুলে বলবেন আমাকে ?"

"সো হোয়াট! আমার কাজের একস্প্লানেশন আমি কাউকে দিই না। তবু বলছি—যেহেতু আপনি নবাগত—ও জায়গাটা চিরকাল ওদের—আপনার কোনো রাইট নেই ওখানে। এটা মেনে নিতে হবে। এখানে হুজ্জুত করলে সুবিধে হবে না। এ-বাড়ির সবাই জানে আমি কেমন লোক। অন্যদের মতো প্যাসিভ

অনলুকার হয়ে থাকবার পাত্র আমি নই।"
দরজা বন্ধ করে দিলো ও।

প্যাসিভ্ অনলুকার হয়ে থাকবার

সুড়সুড় করে ফিরে এলো প্রদীপ। ন
ঝোলানো ক্রুসিফিক্সটা। মাই কংকে
দরজায়। অবিকল আগের মতো সোনা
দিয়ে অভ্যর্থনা করলো ওকে। তারপ
করে দিলো।

নাবালক

কখান জমি আছে কল্যাণীতে ? ব্যাচবেন
জ্ঞস করে হালদার। বড়ো অফিসর, তবে

হ ?" 'আমার' কথাটার উপরে একটু বেশি
প্রদীপ রায়। হালদারের অফিসের এক

লো আমার হরিপদ। কইলো যে-দামে
ই ব্যাচবেন। খুব বালো প্লট—একদিকে

ষাইট ফুট রাস্তা, আর এক
চমৎকার জায়গা। কল্যাণীটা.
থাকনের উপযুক্ত। আমরা বাঙাল
আমাগো। শিয়ালদহর উত্তরে আমা.
কাষ্ঠহাসি হাসলো চানপুরের হালদার।

"দেখুন, হরিপদ ঠিক বুঝতে পারেনি, বেচা হবে ঠিকই, তবে ওটা আমার নয়—আমা: কলকাতায় বাড়ি আছে, তবু কিনেছিলেন, ঐ যে. রিটায়ার করে থাকবার পক্ষে আইডিয়াল জায়গা, . এখন বিক্কিরি করতে চাইছেন, কারণ বাড়ি করবার টা. ছেলেও রাজী নয়, কারণ সে বাইরে বাইরে ঘুরছে—ে. অফিসর। তা, সে যাহোক, আপনি যদি কিনতে চান তো ক বলি। আলাপ করিয়ে দি।" বলে প্রদীপ।

"ও তাই কন। তা, কন না একদিন আইতে। অফিসেই আইতে কন। কথাবার্তা হউক। কতো কইরা কিনছিলেন উনি—তিন শ' টাকা, না পাচ শ'? হরিপদটার বুদ্ধি হইলো না এখনো—নাবালক আব কাবে কয়!"

ছেলেবেলায় দেশের বাড়িতে "লাবাল্লকের লাচ' দেখেছিলো প্রদীপ—দাড়িওলা পঞ্চাশোর্ধ লোকের নতন-কুন্দন। চল্লিশোর্ধ ট্রাউজার-কোট-টাই-শোভিত হরিপদ সুপারভাইজরের কথায় ওর সেই কথা মনে পড়লো।

"আমাগো ত্থাশে, জানেন", বলে হালদার, এককালের লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স্‌এর এম্ এস্ সি—"নাবালকের ভিড়। ল্যাখাপড়া শিখে, তবু বুদ্ধি হয় না। হরিপদর কথায় ভাবলাম জমিটা বুঝি আপনারই। এহন শুনি আপনার শ্বশুরের। তা, আপনি তো শুনছি বাঙাল। বাড়ি আছিল কোথায়—ফরিদপুর, না ঢাকা? আপনে বিয়া করছেন ঘটি মাইয়া—জানা আছিল না। তা যাউক, জমিটা

.নর শ্বশুর ব্যাচে তো কইয়েন,

ন।"

.নে মনে একটু উষ্ণ হয়, ভাবে—এই

বিলেত গিয়েছিলো, ভালো লেখা-

াস হয় না। সফিস্টিকেশনের এতো

.বশ কিছুদিন থেকেই বলছিলেন জমিটা বেচার

।লাও ছবার ছুটিতে এসে বলে গেছে। ওর একটু

পড়েছে যেন ঐ জমিটা বেচার ব্যাপারে। একবার

লা নিজেই ওটা কিনে নেয়। কিন্তু বদলির চাকরি—কবে

য় পাঠিয়ে দেয় কে জানে। তাই ও-চিন্তা বিসর্জন দিয়েছে।

.ল, "ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দেবো।"

"তারাতারিই করবেন," বলে হালদার।

শ্বশুর মশাইকে বললো প্রদীপ। ওর কথামতো ছোটো শালা একদিন আপিসে এলো ওর। নিয়ে গেল হালদারের কাছে।

জমির বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো হালদার। কতোটা জমি, কী পরিমাণ, কী দাম—সব শোনবার পর বললো, "ছাহেন, জমি কিনবো আমার এক বন্ধু—নামকরা ইকনমিস্ট। নাম শুনছেন অ্যাদের ফেমিলির। ওর মায়েরে সকলে কয় রত্নগর্ভা।"

রত্নগর্ভা! শুনে একটু দমে যায় প্রদীপ। একটা—ছটো রত্ন-গর্ভার নাম ও আগেও শুনেছে। এ আবার কোন্ রত্নগর্ভা! "জানেন, আপনে?" বলে হালদার। "বড়ো ভাই বড়ো ডাক্তার, সেকেণ্ড এইটা।, থার্ড আই সি এস। আরাকটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট; আরাকটা অ্যাকচুয়ারি—জানেন, অ্যাকচুয়ারি কারে কয়? ছুটটা আর্টিস্ট। শুনেন নাই অগো কথা? সকলেই আবার ব্যাচেলার—বরোটি ছারা। মায়ের কিরা আছিল বিয়া না করা—কেউ করে

নাই। মা থাকতো অ্যাকচুয়ারির কাছে—মারা গেছে। জানেন, অ্যাকচুয়ারি কারে কয়?"

"হ্যাঁ, জানি। আমিও অঙ্কের ছাত্র।" বলে প্রদীপের ছোট শালা। এম এস সি। কলেজে পড়ায়।

"না, না, জানেন না ঠিক। শুধু অঙ্ক জানলেই হয় না। অ্যাকচুয়ারি মারাত্মক জিনিস—ঈশান স্কলারগুলিও পাশ করতে পারে না। এমন ফেমিলি বাংলা দেশে—বাংলা দেশে ক্যান, ভারতবর্ষে—ভারতবর্ষে ক্যান, পৃথিবীতে দুলর্ভ। অ আমার বন্ধু —একেবারে ল্যাংটা পোঁদের বন্ধু। অ কিনতে চায় আপনাগো কল্যাণীর জমিখান। শোনেন, কাগজপত্র নিয়া আসেন অর আপিসে। হ—ঐ মিডলটন স্ট্রীটে,—চিনেন না? আরে ঐ যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়ি আছিল যেইখানে, সেইখানে অ্যাখেন নাই, মস্ত বাড়ি, ঐখানেই অর আপিস। দশতলা। বিলাতি কোম্পানির আপিস। মাসে অর দশ হাজার কামাই। দামে আটকাইব না—আপনার তো দাম নিয়া কনসার্নডও নয়। কয় কাঠা কইলেন—ছয় কাঠা দশ ছটাক? ঠিক হ্যায়। আমরা এই রবিবারে দেইখ্যা আসি। পরে কইবনে। আপনে দিন পনের বাদে একদিন আইসেন। আইসেন·· আইসেন····বাশ তারিখে। আমি অরে এইখানেই নিয়া আসুমহনে···"

"তা হলে ওঁর আপিসে আর যেতে হবে না তো।" জিজ্ঞেস করে প্রদীপের ছোটশালা।

"যাইতে হইলে পরে যাইবেন। বাশ তারিখে এইখানে।" ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি হালদারেব।

প্রদীপের ধারণা ছিল হালদারই খদ্দের। এখন সে-ধারণা পালটালো। হালদারের বন্ধু নামকরা ইকনমিস্ট, বাংলা দেশের এক রত্ন (রত্নগর্ভার ছেলে যখন), ঐ জমি কিনবে। দামে আটকাবে না। আর দামে আটকানোর কোনো কথাই ওঠে না।

সামান্যই তো দাম, ওরা তো কেনা দামেই বিক্রি করবে—কোনো লাভ চায় না।

প্রদীপ বললো ওর ছোটো শালাকে—"পিণ্টু, তুমি তা হলে কাগজপত্তর নিয়ে এসো ঐ বাইশ তারিখে। কী বার—সোমবার, হ্যাঁ। আমার কাছেই এসো, আমি হালদার সায়েবের কাছে নিয়ে আসবো। তা হলে, মিঃ হালদার, ঐ কথাই রইলো। আপনারা জমিটা দেখে আসুন মীনহোয়াইল।"

"হুঃ।" বলে হালদার।

ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে প্রদীপ দেখা করলো হালদারের সঙ্গে—শালা এসেছে কাগজপত্তর নিয়ে।

গঙ্গার হেইপার আমাগো।—

"আঃ! জানেন, আপনার উপর কী রাগ হইছিলো আমার। কল্যাণীতে গিয়া আপনাগো বর্ণনামতো প্লট খুঁইজা পাই না। আমাগো ভ্যাশের লোকের ডেসক্রিপশন কতো ফল্টি। শ্যাষে

অনেক খুঁইজ্যা 'বি' ব্লকে পাইলা৽
'এ' ব্লক।"

"আমি তো 'এ' ব্লক বলিনি," রাগ
"'বি' ব্লকই বলেছি।"

"আরে, কইলেন 'এ' ব্লক। আমার ভুল হই৽

"'এ' ব্লক আমরা বলতে যাবো কেন, যখন ঙ
ব্লকে। আপনার হয়তো শুনতে ভুল হয়েছে।" প্রদ
বেশ ঝাঁঝ।

"আমার ভুল হয় না, মশয়।" হালদারের গলার স্বর এমনি৹
উঁচু পর্দায় বাঁধা, এখন তা আরো উঁচুতে উঠলো। "বয়স কতে৷
হইল? আমার ডবল।"

প্রদীপের ইচ্ছে করে উঠে পড়ে। সামনে আবার ছোটো শালা
বসে। ও-ই বা কী ভাবছে।

"যাকগে, আমরাই বোধহয় ভুল করেছি। তা, জমি পছন্দ
হয়েছে আপনার বন্ধুর? তাহলে কথাবার্তা বলা যাক।" বলে
প্রদীপ।

"পছন্দ হইছে। না হইলে যা খাটাইলেন সেদিন, আপনারে
বকা দিতাম একটা।"

এবারে সত্যিই উঠে পড়ে প্রদীপ। "পিণ্টু, তুমি তাহলে কথা
বলো, আমার একটু জরুরী কাজ রয়েছে। চলি।" বেরিয়ে যায়
প্রদীপ।

ও নিজের সীটে বসবার মিনিট খানেকের মধ্যেই পিণ্টু এসে
হাজির।

"কী হলো? কথা হলো না?" জিজ্ঞেস করে প্রদীপ।

"ওঁর সঙ্গে কথা বলে কী হবে। কথা বলতে হবে ওঁর সেই
বন্ধুর সঙ্গে। কবে কথা বলা যাবে তা উনি জানিয়ে দেবেন।
আপনি তালে কাগজগুলো রেখে দিন।" বলে পিণ্টু।

.লদারই সব, শুধু ফাইন্যাল করবে

.বছিলো হালদার সরাসরি ওর শালাদের

জড়াবে না। ব্যাপার যা মনে হচ্ছে তাতে

ৎলবে না।

. তুমি নিয়ে যাও, ওর দরকার হবে না। খবর পেলে

.াবো। তোমাদের তরফ থেকে তো ঐ কথা ঃ জমিটা

নামে আগে ট্রান্সফার করাতে হবে। আর তা করাতে

একটা ইনসটলমেন্টের বাকি টাকাটা দিতে হবে। কতো

ন—তিনশো পঁচিশ?"

"তিনশো উনিশ", বলে পিন্টু। "ঐটে লাস্ট ইনসটলমেন্ট। ওটা দিলে আমাদের নামে ফর্মাল ট্রানসফার হবে। তারপর আমরা ওঁর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ওঁকে ট্রানসফার করবো। দাম তো আপনি জানেনই। আর কিছু বলবার নেই। তবে, ঐ টাকাটা না দিলে কিন্তু চলবেই না। ঘর থেকে ঐ তিনশো উনিশ আমরা দিতেই পারবো না। উনি অবিশ্যি মোট দাম থেকে ঐ তিনশো উনিশ কেটে নেবেন। এই তো কথা—আর কী? আর, দাদা হয়তো আসছে এর মধ্যে। এলে দাদাই কথা বলবে। বাবা তো এখন উঠতেই পারেন না।"

দিন পনের বাদে ওর টেবিলে এলো হালদার, সঙ্গে এক পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক—গম্ভীর মুখ, বুদ্ধির ছাপ সেখানে, সম্ভ্রম জাগানো চেহারা। "এই যে, ইনি ডকটর দত্তগুপ্ত। চলেন, চলেন আমার কামরায়। কথা হইব।" বলে হালদার।

হাতে জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও উঠতে হলো প্রদীপকে।

অমায়িক প্রকৃতির লোক দত্তগুপ্ত। চা খেতে খেতে নানান ধরণের আলোচনা হলো।

প্রকৃত শিক্ষিত, মার্জিতরুচির লোক। প্রচুর আয়, প্রচুর জ্ঞান। বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ, সমগ্র বিশ্বের প্রচুর জিনিস নিয়ে আলোচনা

হলো। দেখা গেলো প্রদীপের ধারণার সঙ্গে ওঁর মতের অনেক মিল। বললেন, "আমাদের কলকাতায় বাড়ি থাকলেও কিছুদিন বাদে তো আর কলকাতায় থাকা যাবে না, তাই একটু মফস্বলের দিকে…। কল্যাণীটা মফস্বলের মধ্যে একমাত্র প্ল্যানড সিটি। কাছেও। জায়গাটা আমাদের পছন্দ। আমার বউদির খুব ইচ্ছে। আমরা অনেক জায়গা দেখেছি, কোনোটাই পছন্দ হয়নি। এইটে ঠিক আছে। দামেও খুব শস্তা। তা, আপনি কি দাম কিছু বেশি চান?"

"না, না। মোটেই না। হ্যাঁ, জমিটা কিন্তু, ডক্টর দত্তগুপ্ত, আমার নিজের নয়—আমার শ্বশুরের। মিঃ হালদার বলেন নি সেকথা?"

হালদার তখন ঘরে ছিলো না। থাকলে ওদের ওসব আলোচনা ওভাবে সম্ভবই হতো না মনে হয়।

"না, হালদার তো তা বলেনি। হুঁঃ, ওর নাবালকত্ব ঘুচলো না এখনও। অবিশ্যি কজনেরই বা ঘোচে। সত্যি, মিঃ রায়, আমাদের দেশের অনেক প্রবলেম সলভড্ হতো যদি আমরা সাবালক হতাম। ম্যাচিওরিটির এতো অভাব! দেখুন, আমি তো সারা পৃথিবী ঘুরলাম, বয়েসও হলো পঞ্চান্ন বচ্ছর, চাকরি-বাকরিও নানান রকম করলাম। কোথাও কোনো দেশের লোকের মধ্যে এতো ম্যাচিও-রিটির অভাব—ব্যালান্সের অভাব—দেখলাম না। আমার এক বন্ধু—সেও বিলেত-আমেরিকা গিয়েছে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দাহোমেতে গিয়ে—পশ্চিম আফ্রিকায়—আমি কী খেলাম। আমি বললাম—গণ্ডারের মাংস। ও বললো—গণ্ডারের মাংস তো শক্ত। আমি বললাম, তা কেন হবে! গণ্ডারের চমড়া শক্ত, তার তলায় নরম তুলতুলে মাংস। অতি সুস্বাদু। বিশ্বাস করলো, জানেন?"

হেসে উঠলো প্রদীপ। ডক্টর দত্তগুপ্তও।

"আপনি দেখবেন, মিঃ রায়, আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা। মন্ত্রীমশাইদের কথা

নাই-বা বললাম। প্র্যাকটিকাল ধারণার অভাব—সবাই কর্তাভজা। মাথার ওপরে গার্জিয়ান না থাকলে আমরা অচল। বিদেশী শাসনে আমরা থাকি ভালো। সমস্ত ব্যাপারেই, দেখুন না, আমরা অপরের মুখাপেক্ষী। অপরে কী বলে, কী যুক্তি দেয়। আমরা বড়োই কোমলমতি... ।"

"এবং কোপনস্বভাবও বটি।" ফোড়ন কাটে প্রদীপ। বড়ো ভালো লাগছে ওর এই প্রবীণ, প্রাজ্ঞ লোকটিকে।

মৃদু হাসলেন ডঃ দত্তগুপ্ত। "হুঁ। ভারতীয় চরিত্রের, বিশেষ, বাঙালী চরিত্রের ওসব দিকের কথা যদি তোলেন তো মহাভারত হয়ে যাবে। ক্যারেকটারের অভাব সত্যিই পীড়াদায়ক। প্রবীণ লোকেদের নাবালকত্ব অসহ্য।"

ঘরে ঢুকলো হালদার। "কী, কথাবার্তা শেষ হইল?"

"না, আসল কথা এখনও হয়নি। এতোক্ষণ সব অন্যান্য কথা বলছিলাম।" বলেন দত্তগুপ্ত।

"কী সব অইন্য কথা?"

"নাবালকদের কথা।" বলে প্রদীপ। বলে খুশি হয়।

"নাবালকদের কথা! সেইটা আবার কী?" জিজ্ঞেস করে হালদার।

"বলছিলাম আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকের নাবালকত্ব ঘোচে না।" বলেন দত্তগুপ্ত।

"সত্য কথা। অতি সত্য।" মাথা নাড়ায় হালদার।

প্রদীপ ও দত্তগুপ্তের মুখে মুচকি হাসি।

"আচ্ছা, ডঃ দত্তগুপ্ত। জমি আপনি দেখেছেন এবং তা পছন্দ হয়েছে," বলে প্রদীপ। "এখন ফাইন্যাল কথা বলা যাক। জমির দাম সব সুদ্ধ উনচল্লিশ শো সাতাশি টাকা। ওদের তিনশো উনিশ টাকার একটা ইনসটলমেণ্ট বাকি আছে। ওটা যে-কোনো দিন দিয়ে দিলেই জমিটা ওদের নামে ট্রানসফার হবে। তারপর ওরা

ওটা আপনার নামে ট্রানসফার করে দেবে। ওরা একটি পয়সাও বেশি চায় না। তবে, শ্বশুরমশায় বেকার, ইনভ্যালিড ; শালারা ঐ তিনশো উনিশ টাকা এক্ষুণি দিতে পারবে না। ওরা চায় আপনি ওটা দিয়ে দিন। ঐ টাকাটা দিয়ে দিলেই ওরা ভেতর থেকে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি ওটা ট্রানসফারের ব্যবস্থা করবে। আপনারও যদি কেউ জানাশোনা থাকে ভেতরে, তো আপনিও দেখতে পারেন। ঐ তিনশো উনিশ টাকা আপনি মোট টাকা থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। এর জন্যে একটা এগ্রিমেণ্ট—বায়নানামা, বা অনুরূপ কিছু, —করিয়ে নেবেন। আর তো কোনো ঝামেলা নেই।"

"বাঃ! চমৎকার! এ তো ভালো কথা। ও তিনশো টাকা আমি দিয়ে দেবো—ওঁদের যখন অসুবিধে। আর এগ্রিমেণ্ট একটা করতে পারেন, নাও পারেন। আপনি যখন রয়েছেন।" বলেন দত্তগুপ্ত।

"ওঁরাও জানেন," বলে প্রদীপ, "আমার আত্মীয় বলে বলছি না, লোক খুব ভালো। আমার শ্বশুর মহাশয়ের মতো লোক এ-যুগে দেখা যায় না। জায়গাটাও খুব ভালো। শ্বশুর মশাইয়ের টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় আর বাড়ি করতে পারলেন না। অবিশ্যি ওঁরা আমাদের মতো উদ্বাস্তু নন। আমার টাকা থাকলে জায়গাটা আমিই নিয়ে নিতাম। যাহোক, কবে, কোথায়, আপনার কাছে কাগজপত্র নিয়ে যাবে বলুন। আমি সেই অনুযায়ী ওদের পাঠিয়ে দেবো।"

"আপনিও থাকবেন, মশয়। আমি আপনারেই চিনি।" বলে হালদার।

"এর মধ্যে আপনার-আমার রোল শেষ হয়ে গেলো, মিঃ হালদার। আমাদের দুজনের আর কোনো ফাংশান আছে বলে তো মনে হয় না। এখন কাগজপত্তর দেখা, টাকাপয়সার লেনদেন, সই-সাবুদ ইত্যাদি। আচ্ছা, আমি চলি, ডক্টর দত্তগুপ্ত। আপনি

শুধু জানাবেন কবে, কোথায়, আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রদীপ।

"হ্যাঁ, আমি জানাবো। একটু তাড়াতাড়িই করতে হবে, জানেন। এখন জানুয়ারি, এপ্রিলে আমি ইয়োরোপ যাবো, তার আগেই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। ভেতরে লোক আমারও আছে। ল্যাণ্ড রেভিন্যুতে আমার এক সেক্রেটারি ছিল জানাশোনা—ওতে অসুবিধে হবে না। আর ও তিনশো টাকার জন্যে আটকাবে না —আমি দিয়ে দেবো। আমি শীগগিরই জানাবো আপনাকে।" চলে এলো প্রদীপ।

বলছিলাম, আমাদের দেশের লোকেদের নাববালকত্ব ঘোচে না।

কদিন বাদে ফোন এলো ডঃ দত্তগুপ্তর। "ওঁদের আসতে বলুন পরশু, বিকেলে। পাঁচটার আগেই আসুন। আমি পাঁচটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি। আপনিও আসুন।"

"আমার পক্ষে আসা তো একটু মুশকিল। ছুটির পরে হলে

ভালো হতো। আমার আসার দরকারটাই-বা কী?” বলে প্রদীপ।

“আপনি এলে ভালো লাগবে খুব।” হেসে বলেন দত্তগুপ্ত। “নাবালকদের ভিড়ে আপনি স্বতন্ত্র। আস্থন না একটু চেষ্টা করে।”

ভারি ভালো লাগলো কথাটা—নাবালকদের ভিড়ে আপনি স্বতন্ত্র। “আচ্ছা, যাবো।”

. হঠাৎ বড়ো শালা এসে পড়ায় তাকে নিয়েই গেলো প্রদীপ দত্তগুপ্তের আপিসে। বিরাট মার্কিনী কেতায় সাজানো আপিস, দেখে সম্ভ্রম জাগে।

“দেখ্ন, ট্রানসফারের ব্যবস্থা আপনাদেরই করতে হবে। আমার ঠিক স্থবিধে হচ্ছে না।” যেতেই বললেন দত্তগুপ্ত।

“তা বোধহয় করা যাবে।” বললো বড়ো শালা। “আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজী তো? মানে, আমি ঐ তিনশো উনিশ টাকা অ্যাডভান্সের কথা বলছি।”

“ওতে আটকাবে না। বৌদিরও জমিটা খুব পছন্দ। উনিও তাড়াতাড়িই করতে বলছেন। বৌদিই বলতে গেলে আমাদের গার্ডিয়ান—মা তো নেই।” বললেন দত্তগুপ্ত। কাগজপত্র দেখানোর পর আরো কিছুক্ষণ কথা বলে উঠলো ওরা।

দিন সাতেক বাদে টেলিফোন করলো বড়ো শালা। বললো: “ভেতরে লোক পাওয়া গেছে। ঐ টাকাটা দিলেই সব ব্যবস্থা তুরন্ত করে দেবে। ভদ্রলোককে বলো টাকাটা দিতে। অন্য পারটিও পাচ্ছি, বুঝলে। সে বেশি দিতেও রাজী। তবে তাকে দেওয়া তো আর সম্ভব নয়। একবার যখন ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে।”

“না, তাতো নয়ই। উনিই নেবেন। দেখলেনই তো কেমন স্থন্দর ভদ্রলোক।”

"হ্যাঁ, লোক তো খুবই নামকরা। শোনো, আমি পরশু চলে যাচ্ছি। পিণ্টুকে সব বলে গেলাম। যা করবার তোমাকেই করতে হবে। ডঃ দত্তগুপ্ত টাকাটা দিলেই আমরা জমা করে দেবো। তার দিন সাতেকের মধ্যেই আমাদের নামে ট্রান্সফার হবে। তারপর পুরো টাকা নিয়ে ওঁর নামে ট্রানসফার—অ্যানাদার টেন ডেজ। মাস খানেক বড়োজোর—সব কাজ মিটতে। কী বলো?"

"বলা বড়ো মুশকিল।" হেসে বলে প্রদীপ।

"কেন হে, আবার কোনো গোলমাল হবে না তো? ও ভদ্রলোক বেঁকে বসবেন নাকি? কী বলছো, অ্যাঁ?"

"না, না, উনি নন। আমি ভাবছিলাম সরকারি আপিসের কথা। ওরা অতো তাড়াতাড়ি নড়বে কি?"

"নড়বে নড়বে। পিণ্টুর এক ছাত্রীর মেসোমশাই আছেন ভেতরে,—অসুবিধে হবে না।"

সেদিনই টেলিফোন করলো ডঃ দত্তগুপ্তকে। আপিস থেকে জবাব পেলো ডঃ দত্তগুপ্ত বাইরে গেছেন, ফিরবেন দিন পনের পরে। অবাক কাণ্ড! ভদ্রলোক তো ঘুণাক্ষরেও জানান নি একবার তিনি বাইরে যাবেন।

দেখা করলো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, হালদারের সঙ্গে।

"ডঃ দত্তগুপ্ত শুনলাম বাইরে গেছেন। কোথায়, জানেন নাকি?"

"আমেরিকায়।" জবাব দেয় হালদার।

"আমেরিকায়। সর্বনাশ!" চমকালো প্রদীপ।

"চমকাইলেন যে! জেটের যুগে আমেরিকা ক্যান, চানে যাইতেই বা অসুবিধা কী?"

"না, তা অবিশ্যি নয়। তবে জমির ব্যাপারটা অনেক এগিয়েছে কিনা। উনি থাকলে ভালো হতো।" সংক্ষেপে বললো ভেতরে কী ব্যবস্থা হয়েছে।

"বইয়া থাকেন কয়দিন। আইব, আর সব হইব। বৌদির যখন পছন্দ হইছে।"

"আচ্ছা, বৌদির কথা উনিও বলছিলেন। ভদ্রমহিলাকে খুব মানেন ওঁরা, না?"

"মানবো না!" অমন মাইয়া বাংলাছ্যাশে, বাংলাছ্যাশে ক্যান, ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে ক্যান, পৃথিবীতে কয়টা আছে?"

"বউদির ছেলেপুলে আছে নাকি?" কেমন অদ্ভুত, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে প্রদীপ।

"না। অরাই তো ছেলে।"

আশ্বস্ত হলো প্রদীপ। আরেকটি রত্নগর্ভার কথা শুনতে হলো না।

দু মাস কেটে গেলো—দত্তগুপ্তর ফেরবার নাম নেই। এর মধ্যে পিণ্টু বার পাঁচেক এসে গেছে, বড়োশালা খান সাতেক চিঠি লিখেছে। হঠাৎ সেদিন টেলিফোন এলো দত্তগুপ্তর—"ফিরে এসেছি। শুনেছিও সব। আসুন কালকে। আসতে পারবেন না? একেবারেই না? তাহলে ঐ ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

পিণ্টুকে জানিয়ে দিলো প্রদীপ।

"অবাক কাণ্ড, জামাইবাবু" উত্তেজিত দেখালো পিণ্টুকে। "ভদ্রলোক বেমালুম অস্বীকার করলেন! বললেন, তিনশো টাকা আগে দেওয়া যাবে না। আমি দু-তিনবার বললাম সব রেফারেন্স দিয়ে। উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, না, অমন কোনো কথা ওঁর মনে পড়ছে না। মনে হলো, আমাকে মিথ্যেবাদী ঠাউরালেন। আমি কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমার কেমন যেন লাগছে।"

কেমন লাগলো প্রদীপেরও। মনে হলো কোথায়ও একটা

গোলমাল হয়েছে। যাক, কালকে দত্তগুপ্তর সঙ্গে কথা কয়েই বুঝতে পারবে।

পরদিন সকালে আপিসে গিয়েই টেলিফোন করলো দত্তগুপ্তকে।

"দেখুন, আগে থাকতে টাকা দেওয়ায় কথা তো মনে পড়ে না।" বলেন দত্তগুপ্ত।

"কী বলছেন, ডক্টর" গলাটা কেঁপে উঠলো প্রদীপের! "প্রথম থেকেই তো বলা হচ্ছে কথাটা। আপনি আমাদের আগের আলোচনাগুলো ভেবে দেখুন।"

"ভেবে দেখেছি, এবং আমার ভুল হচ্ছে কিনা সেটা বৌদির সঙ্গে চেক-আপ করেছি। আপনাদের সঙ্গে যা আলোচনা হতো তা যথাযথ রিপোর্ট করতাম তো বৌদিকে। উনি 'না' বলায় নিশ্চিন্ত হলাম।"

কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল প্রদীপ। "ওয়েল, ডঃ দত্তগুপ্ত, নতুন করেই না হয় কথাটা ভাবুন। চার হাজার টাকা মোট দাম থেকে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে দিন। কাগজে-কলমে লেখা হোক। ও টাকাটা না পেলে যে ওরা কিছুই করতে পারবে না।—"

"না, নতুন করেও ভাবতে পারবো না।" অখণ্ড গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন দত্তগুপ্ত। "বৌদি তাতেও রাজী নয়। দেখুন, বৌদি আমাদের গার্ডিয়ান। ওঁর কথাই আমাদের ফাইন্যাল।..."

"বৌদি!" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো প্রদীপ, আর ঝুম করে নামিয়ে রাখলো রিসিভারটা।

সিঁড়ি
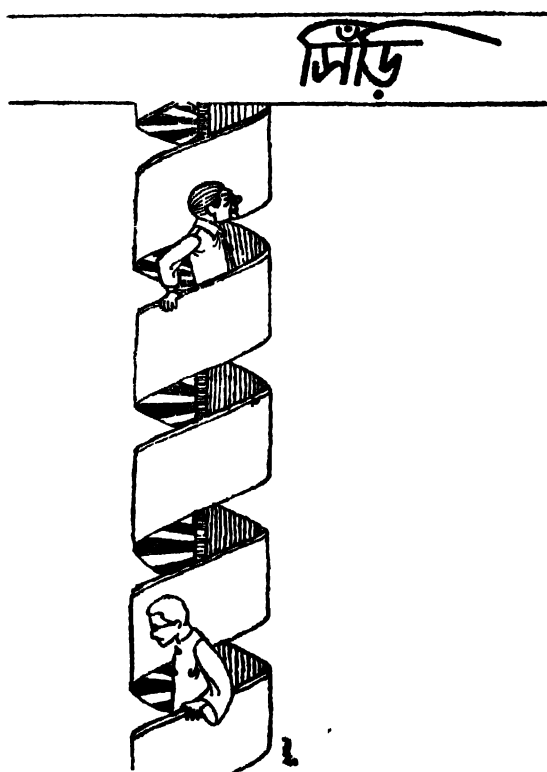
(প্রদীপ রায়ের জবানীতে)

শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে অভ্যর্থনা করলো সবাই। আশপাশের সব বাড়ির লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে। আর সে কী হাসি! সে-হাসিতে নিজেরাও যোগ দিলাম। আমার মন বড়ো প্রসন্ন—রাত জেগে এলে কী হবে। দমদম বা লিলুয়া পেরিয়ে তো বিশেষ যাওয়া হয়নি। এ একেবারে দানাপুর—আদি ই আই আর লাইনে, বর্ধমান, আসানসোল, মধুপুর, জসিডি, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, পাটনা পেরিয়ে। একেবারে স্বপ্নের দেশ—প্রভাত মুখুজ্যের গল্পের দেশ, দিদিমার মুখের রূপকথার দেশ। ন্যাড়ান্যাড়া পাহাড়, রুক্ষ মাঠ, শীর্ণ জলাশয়, বিবর্ণ গাছপালা, কড়া শীত। ওই তো একা-

গাড়ি। কে বেশী খুশি বলা মুশকিল: আমি না আমার তিন বছরের মেয়ে।

অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে উঠলো বড়ো শালির গলা—তাহলে সত্যিই এলে? ধন্যি ছেলে বাবা! পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম, লক্ষ বার বলবার পর। কেন, এ-জায়গা কি খারাপ? দেখছো তো তোমার পজিশন এখানে? বলি, খাতিরের বহরটা দেখছো তো। বাঙাল আরো অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো—

বাংলা ভাষায় মিছরির ছুরি বলে একটা কথা আছে। বোধহয় শান্তিপুরী মেয়েদের কথা শুনেই ওটার চল হয়েছে।

বাঙালকে বাঙাল বললে বাঙাল রাগ করে। উত্তরবঙ্গের লোককে বাঙাল বললে তার খুন করার বাসনা জাগে। উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম চার-বঙ্গের সঙ্গমস্থলে যার বাড়ি তার কেমন লাগে তা শুধু অনুমানের বিষয়। জবাব একটা এলো মুখে, কিন্তু ভাষায় কুলিয়ে উঠলো না—ব্যাণ্ডেল পেরোনোর পর থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সংক্ষেপে বললাম ভায়রাভাই লাহিড়ীমশাইকে—জনাব, ভিড় হঠাইয়ে। অ্যায়সা হোনেসে হম শামকো বকৎ লওটেঙ্গে। ভায়রাভাই জবাবে একটা উর্দু শ্যয়র আওড়ালো—একবর্ণও বুঝলাম না।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হলো, শেষ হলো চা-জলখাবারের পালা। তারপর বড়ো শালির প্রশ্ন—ছুটি ক'দিন? পালাই পালাই করলে চলবে না কিন্তু। অ্যাদ্দিন পরে এলে, ক'দিন থাকতে হবে। এই সময়টাই সবচেয়ে ভালো এখানে। খাবার-দাবার সুবিধে, বেড়ানোর সুবিধে, শরীর ভালো হয়। খুকির শরীর যা করে তুলেছো! তোমাদের আমি ছাড়চি নে।

—ছুটি আছে। কদিন থাকতেও পারি। কিন্তু, একটা কথা। এখানে চলো, ওখানে চলো, এটা দেখো, সেটা দেখো—এসব বললে আমার ছুটি নেই। স্মৃতিসৌধ, নবাবের পেচ্ছাবখানা, চার-ফসলা

শ্যাওড়াগাছ, মা জানকী কোথায় রজস্বলা হয়েছিলেন,—ও-সব দেখবার ইচ্ছে, ধৈর্য, কোনোটাই আমার নেই। আর আপনার দানাপুরের সিনেমা হলে হিন্দি খেল্, পাটনায় গিয়ে বাংলা ছবি—না, ও সবের মধ্যেও আমি নেই। হ্যাঁ, পাটনা যাবো একদিন—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর করা ঐ স্ট্যাচু দেখতে, দানাপুর ক্যান্টন-মেণ্ট যাবো একদিন, আর এক্কাগাড়ি চড়বো একদিন। ব্যস। এ ছাড়া আমার কাজ খাওয়া, ঘুমোনো, বাজার করা, রান্না করা, বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করা, বউঝিদের সঙ্গে তাস খেলা—ঘুমুতেও আপত্তি নেই, আর কাছাকাছি একটু বেড়ানো। এগ্রিড ?

—ও খুকি, শুনছিস তোর বরের কথা। ওমা। এ ক' বছরের মধ্যে এতো ফাজিল হয়েছে। দাঁড়া তো—

তেড়ে এলো দিদি। আমি ছুটে বাইরে গেলাম। একটু বাদে ফিরে এসে—শুনুন, দিদি। ছবেলার মেনু আমি করে দেবো। কিছু কিছু রাঁধবোও। বাধা দেবেন না, তাহলে যে-গাড়ি পাবো তাতেই ফিরবো। হ্যাঁ, শুনুন এবারে। আজ ছপুরে হবে বেগুনের ঠেরুয়া—অনেক সুন্দর সুন্দর বেগুন দেখছি আপনার গাছে—লম্বাটে ধরনের পুরুষ্টু পুরুষ্টু। নাম শোনেন নি ঠেরুয়ার ? হায় হায়! তাহলে শুনুন রেসিপি। বেগুনগুলো ছু ভাগ করুন লম্বা করে, বোঁটার কাছে যেন আটকে থাকে। ধুয়ে তেলমাখান ভালো করে। তারপর কড়াতে চাপিয়ে অল্প জল ছেটান। একটু সরষে বাটা, একটু লংকা বাটা, আদা বাটা দিন, একটু চিনিও দিন। বেশ ভাজা-ভাজা, সেদ্ধ-সেদ্ধ হয়ে গেলে অল্প একটু জল দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন···পাঁচ মিনিট। নামিয়ে নিন। হয়ে গেলো।

—আর কী কী হবে ? এ-প্রশ্নটি বড়োশালির নয়, তাঁর ছোটোবোনের।

—আর হবে বাঁধাকপি দিয়ে অড়র ডাল, টক করে। খয়রামাছ দেখলাম না ? ওগুলো এক বিশেষ ধরনে ভাজা হবে। পাবদা

রয়েছে। ওর ঝাল—সনাতন রান্না। কুচো চিংড়ি দিয়ে পালংশাক—অদ্ভুত। ও গোররা আপনি রাত্তিরের জন্যে রেখে দিন।

—ওমা, তুমি গোররা জানলে কী করে?

—হম সব জানতে হেঁ, হম সবজান্তা হেঁ। হ্যাঁ, গোররার ডালনা রাত্তিরে। ফুলকপির পকৌড়ি আমার দারুন পছন্দ, লেকিন ফুলকপির ডালনা হমে না পসন্দ।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো কালটু। বললো—ও মা, ও মাসিমা, শুনুন মেসোমশায়ের হিন্দি।

—এই নিন, খান। প্লেটে করে কী নিয়ে এলো মিতা।

—কী রে এটা? জিজ্ঞেস করি।

—মেসোমশায় কী? ওটা তো ওমলেট। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে মিতা।

—ওমলেট। কোন ডিমের?

—বত্তককা ডিম।

—বত্তককা ডিম। আরে ছি ছি ছি। ও আমি খাব না।

একটা হাসির গররা উঠলো।

—সব জানো, না? এসো, কান মলে দিই। ওটা হাঁসের ডিম, মশাই। দিদি সত্যি সত্যিই তেড়ে এলো। আমি ওমলেটের প্লেট নিয়ে দৌড়।

—বাঃ কী সুন্দর ডিম, লাহিড়ীমশাই। অগর কোই বেহস্ত হ্যায় তো ওয়া হমীনস্ত, ওয়া দানাপুর, ওয়া 'কেদার-ভবন'।

তিনদিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সবাই। দিবারাত্র ঘরের মধ্যে বসে রান্না-খাওয়া, গল্প গুজব আর খুনসুটি। শেষে বললেন দিদি—

—ও কালটু, যা তো, পব্বর রামকে খবর দিয়ে আয়। ও যেন ওর গাড়ি আর অন্য একখানা গাড়ি নিয়ে বিকেলে চলে আসে। প্রদীপেরা আজ ক্যান্টনমেণ্ট ঘুরে আসুক।

—আহা, আজকেই কেন। সে হবে এখন। বলি আমি।

—না, আজকেই। ব্যাটাছেলে—রান্না ঘরে বসে ইয়ার্কি, না? কালটু, যা তো রে!

—ঠিক হ্যায়। হম কল লওটেঙ্গে। গম্ভীর ভাবে বলি।

—ঠিক হ্যায়। যো তুমহরা দিল চাহে। দিদি হাসেন না।

চারটে না বাজতেই দু'খানা একা এসে হাজির।

উঠে বসতেই টগবগ করে চলতে শুরু করলো। ছেলের আমার হাসি আর ধরে না। ওরা আগে আগে, আমি, কালটু আর মিতা পেছনে পেছনে পব্বর রামের গাড়িতে।

ছেলেমানুষ পব্বর রাম। এক মনে আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। শহরের আওতা পেরুতেই—বাঃ বাঃ বাঃ! দুদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, মাঝখান দিয়ে সোজা মসৃণ রাস্তা, তার দু ধারে গাছের সারি। ভারি সুন্দর। হাসি-ঠাট্টা সব বন্ধ হয়ে যায়, মুখে ফোটে কবিতা—রবি ঠাকুরের ভূত ঘাড় থেকে নামবে কি অতো সহজে!

কখন যে ক্যান্টনমেণ্ট পৌঁছে গেলাম খেয়াল নেই। একা থামতেই তড়াক করে নেমে পড়লাম। তারপর সকলে মিলে এগুলাম একটা পান সিগরেটের দোকানের দিকে। প্রায় সবাই পান খেলো—পশ্চিমের ছোটো ছোটো মিষ্টি পান। তারপর সিগরেট চাইলাম—ক্যাপসটান। দোকানি এগিয়ে দিল উইলস।

—ক্যাপসটান রয়েছে তো, উইলস দিচ্ছ কেন? শুনে দোকানি লজ্জিত হয়, এগিয়ে দেয় ক্যাপসটেনের প্যাকেট। আর ঠিক সেই সময়ের পেছন থেকে—হম চহতে উপর চঢ়তে, তুম চাহ হম নিচু মে যায়। মন্তব্যকারী একাচালক পব্বর রাম।

চমকে উঠলাম। নজর দিলাম পব্বর রামের দিকে।

কালো খাটো ফুলপ্যাণ্ট, চেক শার্ট, লম্বা লম্বা তেলকুচকুচে চুল ব্যাকব্রাশ করা, পায়ে চপ্পল। সাদা ঝকঝকে দাঁত, মিশ কালো গায়ের রং। বছর সতের-আঠারো বয়েস, শক্ত-সমর্থ চেহারা।

চেঁচিয়ে বললাম—পব্বর রাম, তু নে কামাল কর দিয়া। হিন্দিতে আর এগুলো না।—এতো ভালো কথা তুমি শিখলে কোত্থেকে? দি,

—বাঃ, ও শিখবে না! বলে কালটু।—ও তো এবারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে খগোল ইস্কুল থেকে। খুব ভালো লেখাপড়ায়।

বলে কী—অ্যাঁ? এক্কাচালানো চাষার ছেলেটা লেখাপড়া করে—একেবারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে! চুলোয় গেল প্রকৃতি-দর্শন। সমস্ত আকর্ষণ এক মুহূর্তে কেড়ে নিল পব্বর রাম।

এর পর থেকে সমস্তক্ষণ কেবল সওয়াল-জবাব। প্রশ্নকর্তা আমি, উত্তরদাতা পব্বর রাম। কখনও প্রশ্ন হ্রস্ব, উত্তর দীর্ঘ, কখনও সওয়াল ইতনা বড়া, জওয়াব ছোটা সা। প্রতিবেদন শুনুন।

দানাপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে—বাস থেকে নেমে দো কোস পথ—পব্বর রামের বাড়ি। ওটা আরা জেলা। পব্বর রামের বাবা পৈতৃক বৃত্তি নিয়েছিল—জুতো সারাইয়ের কাজ। কিন্তু তাতে চলে না। চলে এলো দানাপুর রেল স্টেশনের কাছে, ডেরা বাঁধলো একটা, আর শুরু করলো এক্কা চালাতে। তা, দু-তিন-চার টাকা দিনে হতো। মেয়েটার বিয়ে দিল, ছেলেকে দিল ইস্কুলে ভর্তি করে। ছেলে দেখা গেলো পড়াশুনোয় খুব ভালো। অঙ্কে ভারি সাফ মাথা। ইস্কুলে ফ্রি হয়ে গেলো। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেও পব্বর রাম পিতৃভক্ত। বাপের শরীর খারাপ হলে গাড়ি সেই চালায়। তাতে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়, তবে পেট চালাতে হবে তো। বাপ ভালো থাকলে পব্বর রাম ট্যুশনি করে—অঙ্ক খুব ভালো শেখায়, দশ-বিশ টাকা পায়। পরীক্ষা এসে গেছে বলে ছেলে পড়ানো বন্ধ আছে। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় বাপের ঠ্যাং ভেঙে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে ওকেই গাড়ি চালাতে হচ্ছে। পরীক্ষার আর তিন মাসও বাকি নেই। বাপ যদি তাড়াতাড়ি ভালো না হয়ে ওঠে তো পরীক্ষা হয়তো দেওয়াই হবে না। ভীষণ ইচ্ছে পড়ালিখা করার, লেকিন রূপয়া কহাঁ? গরীব কো কোই

মনে করে। পব্বর রামের কথা আর না বলবো। যাক, একটা সুবিধে হলো আমাদের। এর পর থেকে, আশা করছি, প্রায়ই তোমার পদার্পণ ঘটবে দানাপুরে—পব্বর রামের আকর্ষণে।

ভারি মজা লাগলো। লিখলাম: পব্বর রাম-বীজের মধ্যে যে কী-মহীরূহ লুকিয়ে আছে তা অবলোকন করা সাধারণের কম্ম নয়। রতনে রতন চেনে। ইত্যাদি।

এপ্রিল মাসে পব্বর রাম চিঠি লিখলো। ইংরেজীতে। কাঁচা হাতের লেখা, তবে পরিষ্কার। ইংরাজীতে একটু-আধটু ভুল আছে, এবং আগাগোড়াই তাতে হিন্দির ছাপ। তবু, ভালো লাগলো। অনেক অনেক ভালো ভালো বিশেষণ প্রয়োগ করেছে আমার সম্বন্ধে। তারপরে বলেছে, পরীক্ষা ভালোই হয়েছে। কলকাতা আসবার ইচ্ছে আছে, লাহিড়ীবাবুকে বলেছে। লাহিড়ীবাবু তো অফিসের কাজে প্রায়ই আসেন, ওঁর সঙ্গেই ঝুলে পড়বে একদিন।

ঝুলে একদিন সত্যিই পড়লো। লাহিড়ী মশাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও ওর পাশের অ্যাটেণ্ডেণ্ট কামরায় চেপে বসলো, আর এক সময় হাওড়ায় পৌঁছেও গেলো। গেটে সটান লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে তার সুটকেশ হাতে করে বেরিয়ে এলো, এবং লাহিড়ী মশাইয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি চেপে সটান চলে এলো আমার বাগবাজারের বাসায়।

তখন গরমকাল। পব্বর রাম এক পুঁটুলি ভর্তি আম এনেছে —সব চমৎকার ল্যাংড়া। আর এনেছে ডিম, অনেকগুলো, সেই বত্তককা ডিম।

লাহিড়ী মশাই পরদিন চলে গেলেও পব্বর রাম রইলো ক'দিন। বেশির ভাগ সময়ই আমার বাড়ির ছাদে গিয়ে বসে থাকে, অবাক বিস্ময়ে দেখে সৌধনগরী, দেখে টালার ট্যাঙ্ক। দু' একদিন ওকে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দেখিয়েও দিলাম।

লাজুক লাজুক হাসিটি ওর ঠিকই আছে। তবে, প্রায় সময়েই থাকে চিন্তিত। কী ব্যাপার, জিজ্ঞেস করায় বললো, চিন্তা হচ্ছে

পড়ালিখা নিয়ে। পাশ তো করবেই, তবে কালেজের পড়া? টাকা পয়সা নেই। বাপের শরীর ভালো নেই, কালেজে পড়তে হবে বাঁকিপুরে, রেল ভাড়া, বই-পত্তর, মাইনে। একা চালানো তো আর সম্ভব নয়।

—ঘাবড়াও মৎ—সব ঠিক হো যায়েগা। আশ্বাস দিই আমি। কৃতজ্ঞতার চাউনি দিয়ে ও অভিনন্দিত করে আমায়।

এর পরে চারটি বছর কেটে গেছে। পব্বর রাম কলেজে ভর্তি হয়েছে, প্রি-ইউনির্ভাসিটি পাশ করেছে, বি এস সি পাশ করেছে। নিয়মিত চিঠি লিখেছে, কয়েকবার কলকাতা এসেছে, আমার বাড়িতেই উঠেছে। আমিও দু'বার-এর মধ্যে দানাপুরে গিয়েছি, ওর বাবা জীয়ন রাম দেবতার মতো ভক্তি করেছে, একায় চড়িয়েছে। পব্বর রামের বই-পত্তর বেশির ভাগ আমি কলকাতা থেকে যোগাড় করে দিয়েছি,—কিনেছি, চেয়ে দিয়েছি। দুবার পরীক্ষা দেবার সময়ে কিছু কিছু টাকাও দিয়েছি। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে ছেলেটার প্রতি। সরল, লাজুক, নিরহঙ্কার, উদ্যোগী। পব্বর রাম 'অফসর' হোক, হাকিম হোক। হরিজন উন্নতি আ[illegible] চাই।

কলেজে পড়বার কালে পব্বর রাম অনিবার্যভাবেই রাজনীতি[illegible] সংস্পর্শে এসেছে। তখন সে কাল মার্কস-এর নাম শুনেছে, শুনেছে আরো অনেকের নাম। কখনও কখনও বলেছেও ওর মনে হয় ও যদি ওর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গরীব জনতার সংগঠনের কাজে যোগ দেয় তাহলেই ভালো হবে। কাজটা খুবই ভালো নিঃসন্দেহে, বলেছি আমি। তবে, তাহলে কিন্তু পব্বর রাম আর অফিসর কি হাকিম হতে পারবে না—অফিসর হবার ইচ্ছে আর আমার ততোটা নেই। ওটা আপনাকে যখন বলেছিলাম তখন সবকিছু জানতাম না, বুঝতাম না। এখন দেখছি একলা উঠে কী হবে, আর সবাই যদি পড়ে থাকে। জবাব দিয়েছে ও।

অতি সত্যি কথা। মনে মনে পব্বর রামের বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনি। মুখে বলেছি, না, পব্বর রাম, তুমি অনেক কষ্ট করেছো নিজের উন্নতির জন্যে, নিজেই ওঠো।

—কিছু মনে করবেন না, দাদা (পব্বর রাম আমাকে এখন 'দাদা' বলে ; আমার তাতে ভালোই লাগে। বাংলাও বলে বেশ।) আপনি অনেকদিন ধরে চাকরি করছেন তো, তাই অফিসর হবার সম্ভাবনায় আপনারা ভীষণ খুশি হন।

কথাটা তেমন ভালো না লাগলেও পব্বর রামের উপর আমি রাগ করতে পারি নে। আর মনে মনে ভেবে দেখলাম খুব একটা বাজে কথাও বলেনি ও। কনিষ্ঠ কেরানি হয়ে ঢুকেছিলাম, আজ যদিও সীনিয়র সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, মাইনে অনেক অফিসরের চেয়ে বেশি, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, সবই আছে মোটামুটি ; তবু তো অফিসরের ছাপ নেই। ক্লাস ওয়ান নই তো। ও-পদে লোভ নিশ্চয়ই আছে।

বটেনিতে অনার্স নিয়ে বি এস সি পাশ করলো পব্বর রাম। বটেনিতে ভালো রেজাল্ট করা সহজ, ও বলেছিলো। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলাম।

পাটনায় একটা মাস্টারি পেলো পব্বর রাম। দানাপুরের ডেরা তুলে দিয়ে বাসা করলো পাটনায়, আর বৃদ্ধ বাপ-মাকে পাঠিয়ে দিলো গাঁয়ে। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে লাগলো। আমাকে লিখে জানালো, রাজ্য সরকারের চাকরি ও করবে না ; চাকরি যদি করতেই হয় তো সর্বভারতীয় চাকরি। ও আই এ এস দেবে।

শুনে খুব খুশি হয়েছি আমি। উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছি ওকে।

তারপর বহু দিন কেটে গেছে। আমি নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। লাহিড়ী মশাই-ও আর বিশেষ আসেন না। আর

এলেও পব্বর রামের খবর রাখেন না, কারণ পব্বর রাম এখন পাটনার বাসিন্দা। পাটনা খুব ছোটো শহর নয়। পব্বর রাম চিঠিও লেখে না, কলকাতায়ও আসে না। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে হয়। মনে হয় ও বোধহয় রেলওয়ে বা অনুরূপ কোনো সংস্থায় অফিসর হয়ে গেছে। আবার মনে হয় আই এ এস একবার মাথায় ঢুকলে অন্য চাকরি চট করে নেওয়া মুশকিল। কখনও কখনও মনে হয়, ও বোধহয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হরিজন উন্নয়নের কাজে লেগেছে। কোনো অলস মুহূর্তে ওর কথা মনে পড়ে। ওর চেহারা। সেই তেলকুচকুচে লাজুক একা-গাড়ির গাড়োয়ান ছেলেটি; সেই সদ্য কলেজীপড়া ভাবটা; সেই আদর্শবান রূপটি; সেই কিঞ্চিৎ 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' টাচ। একদিন একটা চিঠি লিখলাম ওর পুরোনো ঠিকানায়—ফেরত এলো। ভাবলাম, যাক, এতোদিনে ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেলো।

কিন্তু না। হঠাৎ সেদিন পব্বর রাম এসে হাজির। দেখে চিনতে পারিনি প্রথমে। মাথায় বিলিতি মেয়েদের টুপির মতো চুল, টকটকে টাই, টেরিলিনের শার্ট-প্যান্ট, হাতে সিগরেট। ওর হাসি ও কথাতে চিনতে পারলাম। বিস্ময় এবং আনন্দের ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: কী ব্যাপার! এতোদিন কোথায় ছিলে?

—ছিলাম ওখানেই, নতুন একটা বাড়িতে। কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। আই এ এস হলো না। বাবা-মা মারা গেলেন।

—সে কি। কী হয়েছিলো? আহা-হা! সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠি। পব্বর রামই থামিয়ে দেয়।—ভালোই হয়েছে। ওঁরা বুড়ো হয়েছিলেন। তা, দেখুন, আমি এসেছি ইন্টারভিয়্যু দিতে। আপনাদের অফিসর পোস্টের জন্যে—ডাইরেক্ট রিক্রুট। কী করতে হবে বলুন তো?

—বাঃ। তাই নাকি? বেশ বেশ। হ্যাঁ, কাল থেকে ইন্টারভিয়্যু

গুরু। কই, তোমায় নাম তো—। আমি এস্টাবলিশমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। লিস্ট বার করে দেখি, হ্যাঁ, পি রাম আছে একজন।—বাঃ বাঃ! খুব ভালো হলো। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে নেই। দেখো, কী আশ্চর্য, আমি আজ দেড় বছরের ওপর কেবল ভাবি—পব্বর রাম, পব্বর রাম। কোথায় পব্বর রাম। একটা চিঠি লিখলাম—তা-ও ফেরত এলো। বসো, বসো, চা খাও। এঃ, তোমাকে আর চেনাই যায় না। উঠেছো কোথায়? ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি আমি।

—বড়িবাজারে, আমাদের জেলার ছেলেদের মেস-এ।

—আমার ওখানে চলো। আমি আজকাল চৌরঙ্গী স্কোয়ারে থাকি। অবিশ্যি জায়গা নেই বাড়িতে, তবে, হয়ে যাবে এখন।

—আপনি চৌরঙ্গী স্কোয়ারে থাকেন? বাঃ, ভালোই তো। যাবো আপনার সঙ্গে। এদিকে একটা কাজ করতে হবে, দাদা। ইণ্টারভিয়্যুতে কী হয় জানিনে। আপনি তো পুরোনো লোক—অনেক জানাশোনা। একটু বলে দিতে পারবেন না?

—দেখি, দেখি। আরে, তুমি আমাদের অর্গানাইজেশনে আসছো, ভাবতেও ভালো লাগছে। তা, আ'মাকে একবারও জানালে না। যাক, ভালোই হয়েছে। তুমি কোন্ সাবজেক্ট নিয়েছিলে পরীক্ষায়?

—ঐ বটেনি, আমার নিজের সাবজেক্ট। আপনাদের অর্গানিজেশনে এই সুবিধেটা আছে। ফিনানসিয়াল ইনস্টিট্যুশন হলে কী হবে, যে কোনো সায়ান্স সাবজেক্ট নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইন ফ্যাক্ট, আমাকে বটেনিই হেল্প করেছে। সোজা সোজা প্রশ্ন ছিল—খুব লিখলাম। ঐ তে বেশি নম্বর পেয়েই পাশ করেছি, সিলেকটেড হয়েছি। নাহলে ইংরেজী, জেনারেল নলেজ, আমার খুব খারাপ হয়ে যায়। ইণ্টারভিয়্যুতে ঐ জন্যে ভয় করছি। আপনি একটু দেখবেন।

ওর কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। মাথার মধ্যে ঘুরছিলো ঐ কথাটা: বটেনির ছাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অফিসর হয়ে কী কাজ করবে।...সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি আজ যোগাযোগ করছি। ম্যানেজার সায়েবকে বলছি, একজন ডিরেক্টরকেও ধরবো—আমার সোর্স আছে। ডোণ্টওয়ারি!

ছুটির পরে ফ্ল্যাটে এলো পব্বর রাম। চা-জলখাবার খেল। এই প্রথম একটা জিনিস লক্ষ করলাম—আগের মতো ও চা-জলখাবারের পেয়ালা-পিরিচ নিজে হাতে ধুতে চাইলো না। আপিসের বাড়িতে ফ্ল্যাট পেয়েছি, দেখে খুশি হলো। হাসতে হাসতে বললো—এসব অ্যারেঞ্জমেণ্ট ছাড়া মডার্ন মানুষের চলে না। ও যদি সিলেকটেড হয়, তাহলে ও এই রকম একটি ফ্ল্যাটই চাইবে। তখন যেন আমিও চেষ্টা করি। পব্বর রাম এখন অনেক গম্ভীর হয়েছে, বেশ মেপে কথা বলে। কণ্ঠস্বরও দেখলাম বেশ ভারি। খুবই স্বাভাবিক। যাবার সময় আমাকে বললো—দাদা, একটা কথা, আপনি আমাকে শুধু রাম বলে ডাকবেন। সবাই আমাকে ঐ নামেই ডাকে।

পব্বর রামের সঙ্গেই বেরুলাম। রাস্তায় বেরিয়ে ও ট্যাক্সি নিল আর আমি দক্ষিণ কলকাতাগামী এক বাসে উঠে বসলাম—ডিরেক্টরকে ধরতে হবে কল্পতরুদাদা মারফত। পব্বর রাম কি শেষকালে ইণ্টারভিয়্যুতে ফেল করবে? কভী নহী!

ইণ্টারভিয়্যু দিয়ে এসে পব্বর রাম কেঁদে ফেলবার যোগাড়। ভীষণ খারাপ হয়েছে ওর ইণ্টারভিয়্যু। অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইত্যাদি-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের জবাবই ওর ঠিক হয় নি। ও নিশ্চিত যে ওর চাকরি হবে না। আমার আশ্বাস বা স্তোকে, ভবী ভুললো না।

মাস তিনেক বাদে নতুন অফিসরদের লিস্ট বেরুলো, পব্বর

রামের নাম আছে তার মধ্যে। কী খুশিই যে হলাম। ওর বর্তমান ঠিকানা আমার কাছে ছিলো—সেখানে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম অভিনন্দন জানিয়ে। জবাব পেলাম। ও তারপর এক বছরের ট্রেনিং-এ চলে গেলো। যাবার আগে আমার বাসায় একদিন থেকে, অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, প্রণাম-ট্রনাম করে গেলো।

এক বছর বাদে ট্রেনিং সেণ্টার থেকে ওর একখানা চিঠি পেলাম। লিখলো, ওর পোস্টিং হচ্ছে পাটনায়। কিন্তু ও তা চায় না। ও চায় কলকাতা। তা যাতে হয় সেজন্য ও যাচ্ছে দিল্লিতে দরবার করতে। দিল্লি থেকে মন্ত্রীপর্যায়ের কাউকে দিয়ে চাপ না দেওয়ালে বম্বে হেড অফিস কথা শুনবে না।

অন্যান্য নতুন অফিসরেরা একে একে এলো, জয়েন করলো, যার যার পোস্টিং যেখানে সেসব জায়গায় তারা চলেও গেলো—পব্বর রামের দেখা নেই! মাস দুয়েক বাদে ও এলো ওর পোস্টিং-এর চিঠি নিয়ে। হ্যাঁ, কলকাতাতেই হয়েছে। মুখে সাফল্যের হাসি, পব্বর রাম দেখা করলো আমার সঙ্গে—অফিসে। ভারি খুশি হলাম ওকে দেখে। ও কিনা শেষকালে আমার আপিসেই এলো অফিসর হয়ে। সেই পব্বর রাম, অ্যাঁ? সেই রাত্তিরেই দানাপুরে বড়োশালিকে চিঠি লিখলাম: বীজ থেকে গাছ হওয়া দেখেছেন? সে-গাছ যারা জল ঢেলে বড়ো করে, সে-গাছে ফল ধরলে তাদের যেমন লাগে, অনেকটা তেমনই লাগছে আমার।... জবাব এলো তুরন্ত: তুমি পব্বর রামকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছো। দেখো, পব্বর রাম তোমাকে তুলে ধরে কি না। ও এসেছিলো। বলে গেছে, ওর পজিশন এখন তোমার ওপরে।

কেমন কটু লাগলো কথাটা। তাই তো, পব্বর রামের র‍্যাংক তো আমার উপরে এখন। পরমুহূর্তেই হেসে ফেললাম। আরে, দূর! ওর সঙ্গে কি আমার আপিসের পদ নিয়ে সম্পর্ক? দিদি একটু হুল ফুটিয়েছেন।

আমার আপিসে হলেও আমার ডিপার্টমেণ্টে নয় পব্বর রাম। অন্য বিলডিংয়ে বসতে শুরু করলো ও। আপাতত ও থাকছে নিউ আলিপুরে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। আপিসের ফ্ল্যাট চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছে। সে-দরখাস্ত আমারই মুসাবিদা করা। আমি বলেছিলাম—রাম, পাশের বড়ো বাড়িটায় একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। আমি ওটায় যাবো ঠিক হয়েছে। আমি গেলে তুমি যাতে করে আমার এই ছোটো ফ্ল্যাটটা পাও তার জন্যে চেষ্টা করবো।

উই বিলং টু সেপারেট ক্লাসেস।

রোজই ওর সঙ্গে টেলিফোনে একবার করে কথা বলি। রোজই ওকে আমার বাড়িতে আসতে বলি। ও বলে, আসবে। তবে, এখন নিউ আলিপুর থেকে যাতায়াত—তাই সময় পায় না।

দিন পনেরোর মধ্যেই ফ্ল্যাট পেয়ে গেল পব্বর রাম। পাশের বাড়ির যে ফ্ল্যাটে আমার যাবার কথা ছিল সেটাই পেল ও।

খবর পেয়ে দেখা করলাম এস্টেট অফিসরের সঙ্গে। ভালো মানুষ। বললেন, ওটা তো আপনাকে দেবারই ডিসিশন হয়েছিলো ; কিন্তু মিঃ রাম জোর করায় তাঁকেই দিতে হলো। আফটার অল, ওঁর র‍্যাংক বড়ো। উনি সেটার উল্লেখও করলেন। তাছাড়া, দিল্লিতে ওঁর 'পুল' আছে।

একটু চমকালাম। এক ঘরের ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন রয়েছি দু-তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে। বড়ো ফ্ল্যাটটা পাবো নিশ্চিত ছিলাম। পব্বর রামকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম অতো বড়ো ফ্ল্যাটে ওর কী প্রয়োজন। জবাবে হেসে বললো, ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে, এবং উইদিনে মান্থ ও ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠছে ঐ ফ্ল্যাটে। আমার ফ্ল্যাটটা বড়োই ছোটো। ও জানে ওর প্রয়োজন আমি বুঝবো। এটাকে আমার ম্যাগনানিমিটির আর একটি নিদর্শন বলেই ধরে নিচ্ছে ও। একদিকে ফ্ল্যাট না পাওয়াব অসন্তোষ, অপরদিকে পব্বর রামের সৌভাগ্যে আনন্দ, এই মিশ্র অনুভূতি কাটাতে, অতএব, ঠাণ্ডাকড়া পানীয়ের প্রয়োজন হলো।

মাসখানেকের মধ্যেই পব্বর রাম সস্ত্রীক এসে উঠলো নতুন ফ্ল্যাটে। আমার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে সেটা দেখা যায়। দেখলাম অনেক জিনিসপত্তরে সাজগোছ করছে ওরা। আ.মার আয়া এসে বললো ওদের নতুন ফ্রীজ, সেফ, সোফা-সেট, রেডিওগ্রামের কথা। ওর বিয়ের নেমন্তন্ন-চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু, কে যাবে মুঙ্গেরে? কলকাতায় ওরা এলে যোগাযোগ করা যাবে, উপহার দেওয়া যাবে, খানাপিনা হবে ভেবে রেখেছিলাম। বলেও রেখেছিলাম পব্বর রামকে। আর এখন তো পাশাপাশি বাড়ি। যে যোগাযোগ আমাদের মধ্যে কমে গিছলো তা আবার বেড়ে উঠবে। ওরা এসে যাওয়ায় খুশি হলাম খুব। কখন আমার ফ্ল্যাটে ওরা আসছে—এই অপেক্ষায় থাকলাম।

দু'-তিন দিন কেটে গেলো, ওরা এলোনা। গোছগাছ করায়

ব্যস্ত রয়েছে বেচারিরা—নতুন সংসার পাতছে তো। ওর ছুটি এখনও চলেছে। নিজেই যাবো ভাবলাম। কিন্তু ঠিক মতো সময়ই পাইনে। পাশের বাড়ির ফ্ল্যাট হলে হবে কি, যেতে সময় লাগে বেশ। আমার বাড়ির চারতলা থেকে লিফটে করে নেমে বড়ো রাস্তা পেরিয়ে ওদের বাড়ির উল্টোদিকের গেট দিয়ে ঢুকে লিফটে করে পাঁচতলায় গিয়ে করিডোরের পর করিডোর পেরিয়ে তবে ওদের ফ্ল্যাটের দরজায়। তারপর ওরা থাকবে কিনা তখন কে জানে। সন্ধ্যেবেলা ছাড়া তো সময়ই নেই আমার।

তবু, না গিয়ে আর পারলাম না। ওদের লিফট অচল। সিঁড়ি ভেঙে ওঠা যে কী কষ্টকর—নামাটা সহজ। তবু, হাঁটতে হাঁটতেই উঠলাম পাঁচতলা। ওর ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দেখি ড্রইং রুমে লোক ভর্তি—তার মধ্যে আমাদের সংস্থার কিছু ক্লাস ওয়ান অফিসরকেও দেখলাম। দু' একজন আমার বেশ পরিচিত। ওরা সমাদর করে বসালো। মিঃ রাম নেই, ওরা বললো, এক্ষুনি এসে পড়বে। বুঝলাম, এ রিসেপশন পব্বর রাম দিচ্ছে। অনাহুত এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। ওজর দেখিয়ে উঠে পড়লাম। পেছনের দিকে স্পাইর‍্যাল স্টেয়ারকেস ধরলাম। ওর সিঁড়িগুলো ছোটো ছোটো আর ঘোরানো হওয়ায় নামার কষ্টটা ঠিক্ বোধগম্য হয় না।

মাঝপথে একেবারে পব্বর রামের মুখোমুখি। কেমন একটু বিব্রত দেখালো ওকে। তবে, মুহূর্তেই মধ্যেই একটা গম্ভীর, উদ্ধত ভাব নিয়ে এলো মুখে।

বললাম—পব্বর রাম, তোমাদের খোঁজে গিছলাম। তোমরা তো এসে একবার দেখাও করলে না। তা, আজ বুঝি তোমার পার্টি। ভালো কথা। হ্যাঁ, শোনো, আমি তোমাদের নেমন্তন্ন করতে গিছলাম। এই রোববারে—।

কথা শেষ করতে দিল না ও। বললো—না, সময় হবে না।

—তবে, কবে ? জিজ্ঞেস করি আমি।

—দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমাদের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক বোধহয় আর রাখা চলে না। উই বিলং টু সেপারেট ক্লাসেস। আপনি তো আমার ওয়েলউইশার। আশা করি আপনি এটা মনে রাখবেন। আচ্ছা, চলি। দে আর ওয়েটিং। গট গট করে উপরে উঠতে লাগলো ও।

মাথাটা সামান্য ঘুরে গেলো, আর তাইতে পা স্লিপ করলো। ভাগ্যিস জমাদার উঠছিল সিঁড়ি দিয়ে, তাই, দু-তিনটে সিঁড়ি গড়াতেই ধরে ফেললো ও। বেঁচে গেলাম। শক্ত করে লোহার রেলিং ধরে উপরে তাকালাম। পব্বর রাম সোজা পদক্ষেপে উপরে উঠছে।

এই বাঞ্ছিত ভূমি

(প্রদীপ রায়ের দিনলিপি)

সারারাত ধরে জগঝম্প বেজেছে—ভারত ভবনের দারোয়ান-
'য়ারাদের সঙ্গীত সম্মেলন। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
কতোক্ষণ। চারটে বাজতেই ইংরেজী কাগজের হকারদের
শী চিৎকার—ঠিক দেশের বাড়িতে বুনোদের শুয়োর মারা
ক ঘুম ভেঙ্গে গেলো—রোজই যায়। বাথরুমে ঢুকে

চোখেমুখে জল দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চতুর্দিকে অন্ধকার, কেবল আমাদের বাড়ির সিঁড়ি আর লিফটের মাথায় আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে হঠাৎ খটখট শব্দ—একটা লোক ওপরে উঠছে। আঁতকে উঠলাম! এমন সময়ে, এই শেষ রাত্তিরে, কে আসছে রে বাবা! ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হলো—ও হরি! এ যে দেখছি আমার আখবরওয়ালা। কোনোদিন ওকে দেখতে পাই নে—সেই কোন সকালে কাগজ দিয়ে যায়ঃ কলকাতায় আমার চেয়ে সকালে কেউ কাগজ পায় না বোধ হয়। আমাকে অন্ধকার বারান্দায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও একটু অবাক হলো নিশ্চয়ই। কাগজখানা ফেলে না দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিলো।

বাংলা কাগজ কঁহা? জিজ্ঞেস করি।

থোড়ি দেরমে মিলেগা, সাব। জবাব দেয় ও।

কাহে, দের কাহে?

ইধর বাংলা কাগজ অর কোই নেই লেতা, ইসিবাস্তে—।

চলে গেলো ও। সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা কাগজের আপিসে ঢিল ছুঁড়লে গিয়ে পড়ে। ঢিল ছুঁড়তেই ইচ্ছে করলো।

আলো জ্বেলে কাগজ পড়তে লাগলাম। লোকসভায় কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা—বাঙ্গালীর চাল-প্রীতির নিন্দে···অনাহার মৃত্যু....উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাণ্ডকারখানা...চেম্বার অব কমার্সের বিবৃতি···কম্পানীর হেড অফিস স্থানান্তরকরণ···টুরিস্ট কর্তৃক বম্বে শহরের প্রশংসা···খেলার মাঠের কোঁদল ··কালচারাল ফাংশন··· কবিতার দৈনিক·· কফি হাউস ইনটেলেকচুয়ালেদের নতুন উদ্যম···

হাঁ, জী! কাংস্যকণ্ঠের আওয়াজে মনোযোগ ছিন্ন হলো।

জলদি, জলদি কার্ড দিজিয়ে না! কার্ড অর্থে দুধের কার্ড। ডিপো থেকে দুধ নিয়ে আসে এই আয়া, এ-বাড়ির আট ন'টি ফ্ল্যাটের দুধ আনে ও। এখানের কাজ শেষ করে অন্যত্র যায়। তাই, ভোর না হতেই এর উৎপাত।

দুধ এসে গেলো। গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে নিজেই চা করে খেলাম। গৃহিণী তখনও নিদ্রারতা।

-রাম, রাম, বাবুসাব! দ্বিতীয় আয়া। বেহারি, ভাঙ্গা, ভাঙ্গা বাংলা বলে। ওর সম্বোধনের বৈচিত্র্য আছে; কখনও বাবু, কখনও দাদা, দু একবার ভাইয়াও বলেছে। পাঁচ মিনিটে বর্তন ধোওয়া শেষ করে, রোজকার বরাদ্দ চা খেয়ে, যাবার সময় বলে গেলো: 'দিদি, দাদাকে বইলে বিম পাউডার আনান। একদম ফুরিয়ে গেসে। আইজ তো রিখা দিয়া বর্তন ধো দিয়া। বাঙ্গালীরাই শুধু কানসার বাসন রাখে আর রিখাসে ধোয়। হাঃ হাঃ!...ও আবাব বেলা দশটায় এসে পাঁচমিনিটে কাপড়া ধোবে (ধোওয়াই—কাচা নয়), আর বিকেলে পাঁচ মিনিটে বাসন মাজবে। দরমাহ্ পঁচিশ টাকা। বলতে ভুলে গেছি, দুধ আনা আয়ার মাইনে পঞ্চ মুদ্রা।

ওমা, প্রেসওলা এলো না; কী পরে যাবো স্কুলে?—বড়ো মেয়ের কাতরোক্তি। প্রেসওলা মানে ছাপাখানার মালিক নয়, ইস্তিরিওয়ালা। বলতে বলতেই ইস্তিরিওয়ালা এসে হাজির।
—কাহে দের কিয়া ইৎনা? মেয়ে খেঁকিয়ে উঠলো।

সোনা বাঁধানো দাঁত বার করে বলে রাহ্মান—দের কহাঁ! আবি তো ঠিকটাইম পর আয়া হুঁ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে—জানেন, সাহেব, আগে এ বাড়িতে এক বাঙ্গালী ইস্তিরিওয়ালা আসতো—আমাদের ক্রুকেড লেনেরই। কোনোদিন ঠিক টাইমে আসতো না দেখে সবাই আমাকে বহাল করে। আমার দেরি হয় না। সাড়ে আট বাজে স্কুল—আমি ঠিক সওয়া আট বাজে চলে আসি। ইস্তিরিওলার ঘর হাজারীবাগ।

পাশের ফ্ল্যাটের ডি ক্রুজের মেয়ে এলো আমার মেয়ে তৈরি হয়েছে কি না দেখতে। ওরা দুজনেই লোরেটোয় পড়ে একই ক্লাসে। ওর বাবা সকালবেলা ওদের একসঙ্গে নিয়ে যায় ইস্কুলে।

বিকেলবেলা আমার মেয়ের মা ওদের ইস্কুল থেকে নিয়ে আসে। সকালবেলায় দিয়ে আসার কাজটা আমরা চেয়েছিলাম—ডি ক্রুজের বউ লিজা বললো বেলা বারোটার পরেই ওর মাথা ধরে। তা—ছাড়া, ইস্কুল ছুটির সময়ে রাস্তার বেংগালিবাবুদের ভিড়। অগত্যা, আমার স্ত্রীকেই—।

ডি ক্রুজের মেয়ে আমার মেয়েকে বলে: You Bengalee, you Indian ; I Goan, I European. সালাজারের এমন যোগ্য শিষ্যার বয়েস মোটে আট বছর। Aunty, teacher said Mandira is a Bengali name. It should be changed. হি, হি, হি! ডি'ক্রুজের মেয়ে জেনির কী হাসি। টিচার সেড বেঙ্গলীজ শুড রীড ইন বেঙ্গলি স্কুলস।...ডিক্রুজের মেয়ে পড়া পারে না, লাষ্ট বেঞ্চে বসে, মাথাভর্তি উকুন, আর সব সময় আঙুল চোষে। আমার মেয়ে আর থাকতে পারলো না। হাতের পাউডার পাফটা ফেলে দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো: ইউ লাউজি গোয়ান, ইউ গেট আউট অব বেঙ্গল! হাসবো না কাঁদবো ঠিক করতে না পেরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

বাথরুমের দরজায় টোকা—খুলে দেখি জমাদার। নমস্তে সাব! বললো ফরাক্কাবাদের গুলাব জমাদার

ওয়াশ বেসিনের ওয়াশারটা খারাপ—একবার মিস্তিরিকে ডাকো তো। ক'দিন আগেই ঠিক করে গেলো—আবার খারাপ! বলি আমি।

জমাদার ডাকলো মিস্তিরিকে। ঈশ্বর খুন্তিয়া বালেশ্বরের লোক। বললো—আমি ছিলাম না। বদলির বঙ্গালি ছেলেটা ঠিক করে কাজ করে নাই। প্লাম্বারও বাজে—আগে কনট্রাক্টর ছিলো জেনা—কোনো অসুবিধা ছিলো না! এখন আবার ঘোষ কোম্পানি।...সব বাঙ্গালি ভূত! হুম করে বলে ওঠে গুলাব জমাদার। একগাল হেসে, 'আমি করে দেবো' বলে, নমস্কার করে চলে যায় ঈশ্বর খুন্তিয়া।

বাজারে যাবার মুখে ডিক্রুজের সঙ্গে দেখা—ও মেয়েদের স্কুলে দিয়ে ফিরছে। হোয়াই সো লেট টুডে?—হেসে জিজ্ঞেস করে ডিক্রুজ।

ইউ গেট থিংস চীপার নাউ। হেসেই জবাব দিই।

চীপার? মাই ফুট! ক্যালকাটা ইজ টেরিবলি কস্ট্‌লি। বম্বে, ডেল্হী, ইন ফ্যাক্ট, অল আদার সিটিজ, আর ফার চীপার। অ্যাণ্ড অব কোর্স মোর ডিসেণ্ট। গম্ভীর হয়ে বলে ডিক্রুজ।

মোর ডিসেণ্ট দে মে বী, বাট নট চীপার। অ্যাট লীস্ট নট বম্বে। বলি আমি।

ও, নো, নো! ইউ ডোণ্ট নো। ইউ মে গেট ইয়োর বেঙ্গলি ষ্টাফস অ্যাট চীপার রেটস, বাট নট আওয়ার টিংস। নট ওনলি ফুডস্টাফস, বাট এভরিথিং এভরিথিং,! সী দ্য স্কুলস্! সী দেয়ার ট্যুশন ফীজ। টার্টিটু রূপীজ পার মান্‌ট্‌ ফর এ স্মল গার্ল।

বাট লোরেটো ইজ এ ক্যাথলিক স্কুল—নট বেঙ্গলি।—হাসি হাসি মুখ করে বললাম। কথা বাড়ালো না গোঁড়া ক্যাথলিক মেলভিল ডি ক্রুজ, ক'দিন আগেও যে আমাকে বলেছে গতো পনের বছরের মধ্যে সে কখনও চৌরঙ্গী স্কোয়ার (বাড়ি) আর দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট (আপিস) ছাড়া আর কোথায়ও পা বাড়ায় নি।

বাজারে দেখা মিঃ ভাটিয়ার সঙ্গে—ইন্দর মোহন ভাটিয়া—প্রতিবেশী। বেঁটে, মোটা, টেকো, ফর্সা, মাঝবয়েসী লোকটি।

গুড মর্ণিং, মিঃ রায়, ফিনিশড্‌ মার্কেটিং?

নহী জী। হম তো আবভি আতে। জবাব দিই।

মাটন ইজ সিক্‌স্ রূপীজ টুডে, অ্যাগস নাইন এ্যানাজ এ পেয়ার, পরবল ওয়ান ফিফটি, তুরাই ওয়ান রূপী, করেলা ওয়ান থার্টি, মছলি ভি পাঁচ রূপয়া। দেহলিমে হর চীজ চীপার, তাজী ভি হ্যায়। কেয়া হো গয়া আপকা কলকত্তা!

কলকাতায় কতোদিন আছেন, মিঃ ভাটিয়া?

তা প্রায় পঁচিশ বছর।

আচ্ছা, আপনাদের তো অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস—ট্রানসফারেবল জব। হোয়াই ডোণ্ট্ গেট এ ট্রানসফার টু ডেহলি? ম্যয় ভি ট্রান্সফার লুংগা!

ট্রানসফার নেওয়া যায়। কিন্তু, দেখিয়ে, আমার যতো আপনার জন, রিলেশন্স, জান-পেহ্চান আদমি—সবই কলকাতায়। চাকরি, ব্যবসা, সব কলকাতায়। আমার এক লেড়কা নোকরি করে এখানে, আরেক লেড়কা ব্যবসা করে—ঐ তো আপনাদের আপিসের সামনে ঐ রেডিওর দোকান। গতো চার-পাঁচ সালের মধ্যে সব দেহলিসে কলকাত্তা পৌঁছে গেল। সকলেই ভালো ব্যবসা করে। ধনপালের সমুন্দর রেষ্টুরেণ্ট, সম্বর বার, খেড়ার মোটর পার্টস এণ্ড এ্যাকসেসরিজ, খোসলার কিউরিও শপ, কপুরের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ…দেহলিতে ওরা সুবিধে করতে পারেনি—গভর্নমেণ্ট হেলপ পেয়েও। এখানে সিন্ধিরা টাকা দেয়—কোই হরজা নেই। তা ছাড়া দেখুন, কলকাতায় যতো টপ অফিসর—সরকারি-বেসরকারি—সব পঞ্জাবী। হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট পঞ্জাবী, ফ্যাশনেবল ব্যবসা সব পঞ্জাবী, ফ্যাশনবেল লোকালিটি সব আমাদের, চৌরঙ্গী আমরা ক্যাপচার করেছি—হাঃ হাঃ! কি, মিঃ রায়? ব্যাংগালমে বাংগালিকা হাল আচ্ছা নহী। সরল প্রাণ ভাটিয়া চলে গেলো।

রামদাসের দোকানে আলু, ভোলেনাথের দোকানে ভাজি-মিরচা কিনে, দানাপুরের জামুনের দোকানে কিনতে গেলাম মাছ। জামুন খাতির করে রেখে দিয়েছে একটি মরা শোলমাছ—এ বাজারে ও মাছ কেউ পোঁছে না, আবার ঐ সব বাঙ্গালি মাছের দাম এখানে বেশি। এমনিতেই তো দাম এখানে সব জিনিষেরই বেশি, আর দরদাম করা এখানকার দস্তুরও নয়।

মুদি মহাবীর প্রসাদের দোকানে ভালো কড়ুয়া তেল নেই। ভালডা খাইয়ে—হর আদমি খাতা। উপদেশ দিলো ও।

ফেরার পথে গ্র্যান্ট ষ্ট্রীটের অযোধ্যাপ্রসাদের দোকানে ঢুকলাম ছিট কাপড় কিনতে। অযোধ্যা প্রসাদের ঝোলা গোঁফ আরো ঝুলে পড়েছে—মুখ গম্ভীর। কোনো সমাদর করলো না। জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার ?

গম্ভীরস্বরে বললো,—ইধরকা আদমীকা আদৎ ইৎনা খারাপ হো গয়া !

বাড়িওলার ছেলে সাত সকালে ওকে উপদেশ দিয়ে গেছে ইলাহাবাদে গিয়ে ছকান খুলতে। অযোধ্যাপ্রসাদ ইলাহাবাদের লোক। ব্যাপার কী ? না, অযোধ্যা প্রসাদের বাপ যখন এই দোকান খোলে তখন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জন্ম হয়নি। এই ঘরেই দোকান খোলে। ভাড়া কুড়ি টাকা। সেই কুড়ি টাকা বেড়ে পঞ্চাশ টাকা হয়েছে। বাড়িওলা বাড়ি মেরামত করে না। এই নিয়ে কথা হতেই বাড়িওলার ছেলে বলেছে ঐ কথা। না, বাবুজী, বংগাল মুলুকে আর ব্যবসা করা যাবে না। ইহাঁকা আদমি বাহৎ খারাব হো গয়া।

বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে উঠে পড়লাম। ছিট পরে কিনবো। লিফটে দেখা স্বামীনাথনের সঙ্গে। কফি সীড কিনে ফিরছে, সঙ্গে একটি তরুণ। উইশ করে বলে, আমার কাজিন রামঅমৃতম—এখানে এলো চাকরির চেষ্টায়। একটু খবর-টবর দিয়ো।

কী কোয়ালিফিকেশন ? জিজ্ঞেস করি।

এম এ, এল এল বি, সেক্রেটারিশিপের ছটো পার্ট, ইনস্যুরেন্সের একটা পার্ট পাশ। টাইপ জানে, শর্টহ্যাণ্ড জানে, জর্নালিজমে অভিজ্ঞতা আছে-পালঘাটে একটা কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলো, মাদ্রাজে একটা পাবলিসিটি ফার্মে কপি লিখতো।

তা, মাদ্রাজে কিছু হলো না ?

না, না, কলকাতা ছাড়া ভালো চাকরি কোথায় ? ক্যালকাটা ইজ ইণ্ডিয়াজ সিটি, তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের।

অ্যাণ্ড উইদাউট সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রেন ইউ ক্যানট ডু ছাট। খুব সহজ, স্বাভাবিক স্বরে বললো স্বামীনাথন।

স্বামীনাথন এস এস এল সি পাশ ক'রে কলকাতা এসেছিলো বিশ বছর আগে। আজ সে একটি বড়ো ফার্মের এক ডিপার্টমেণ্ট-ইনচার্জ। প্রাজ্ঞ লোক, সব ব্যাপারেই তার একটা বক্তব্য আছে। কাগজ পড়ে 'হিন্দু', পত্রিকার মধ্যে 'কলকি', আর 'রীডার্স ডাইজেষ্ট'। রবিবারে রামকৃষ্ণ মিশন ইনসট্যুট অব কালচারে বক্তৃতা শোনে, রোববারে তমিল ছবি দেখে, রসিক রঞ্জন সভার সভ্য।

চান করতে ঢুকবো, এসে দাঁড়ালো ছুই লিফটম্যান—রমজান ও বলভদ্র, আর জমাদার গুলাব। মণি অর্ডার ফর্ম ভর্তি করতে হবে। রমজান তার বিহার শরীফের বাড়িতে পাঠাচ্ছে একশো টাকা, আর কোন এক মোতি বিবিকে পঁচিশ টাকা; বলভদ্র পিপলির সুভদ্রা দেবীকে একশো পঁচিশ টাকা; গুলাব তার বাড়িতে পাঠাচ্ছে একশো টাকা।

কেয়ারে, গুলাব? কিৎনা প্যয়সা তন্‌খা মিলতা? জিজ্ঞেস করি।

দোস' টাকা।

আমার এক বি এ বিটি পাশ আত্মীয় মাস্টারে· মাইনে একশো আটষট্টি টাকা।

দোসওসে কাট নেতা প্রফণ্ড অর উধর। হাথমে মিলতা একশ বিস। একসও ঘরমে ভেজতা, হাথমে রহতা বিস। বললো গুলাব।

সে কী! বিশ রূপীয়ার চলে যায়?

জী, হ্যাঁ। মকানের কিরায়া নেই, বকসিস হ্যায়, ফালতু কামভি করতে···।

হর মাহিনা সও রূপয়া ভেজতা?

জী, হাঁ।

কেয়া করতা রূপয়াসে?

ক্ষেতি কিয়া, মকান বনায়া, অর কেয়া?—একটু পাগলাটে টাইপের লোক, সাফ কথা বলে।

আপিসে ঢুকতে দেখি ছোটো পোষ্টাফিসটার সামনে বিরাট লাইন—মনি অর্ডারের লাইন। লাইনে যারা দাঁড়িয়ে তাদের বেশির ভাগই উর্দি পরা, কারোর মাথায় পাগড়ি, অনেকের বড়ো গোঁফ।

অফিসে গিয়ে দেখি ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা নেই—কেউ গেছে দেশে, কেউ লাগিয়েছে পোস্টাফিসে লাইন। তেওয়ারী একলা বসে খৈনী বানাচ্ছে। ও আবার জল দেয় না। অনেকক্ষণ পরে অন্য ডিপার্টমেণ্টের একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। পূর্ববংগের ছেলে বেয়ারা, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে আর জল আনতে বলা চলে না। লজ্জা করে। জল না খেয়েই কাটাতে হলো আধঘণ্টা।

পাশের টেবিলে আলোচনায় উৎকর্ণ হই। দুই ছোকরা অফিসর—একজনের বাড়ি লক্ষ্ণৌ, আরেকজনের অমরাবতী। আলোচনার বিষয়বস্তু রমণী।

সুইট বেঙ্গলি গার্লস এণ্ড সুইট বেঙ্গলি রসগুল্লা আর অল গন। বলে একজন।

বেঙ্গলি গার্লস আর সো গ্ল্যামারলেস। ইউ ক্যান্নট টেক দেম টু পার্টিজ। বললো আরেকজন।

সাব ইজাজৎ দিয়া হ্যাঁয়। বড়ো সায়েবের বেয়ারা নিখুঁত উর্দু বলে। মীরাটের লোক।

রায়, যাও, ঐ উমিচাঁদ কিষেণলালের এনকোয়ারিটা সেরে ফেল। আর ফেরবার সময় কড়োরটিয়ার অফিসটা ঘুরে এসো।—বললেন দেশাই সায়েব।

উমিচাঁদ কিষেণলালের ওখানে গিয়ে শুনলাম ওরা ওদের লোন এ্যাপ্লিকেশন উইথড্র করেছে—মস্ত মস্ত দুই ফিনানিসয়ার জুটে গেছে ওদের যারা টাকা রাখবার জায়গা পাচ্ছে না। সত্যি টাকা

রাখবার এই প্রবলেম বম্বেতেও নেই। ওদের রেজিষ্টার্ড অফিস কলকাতায়, শেয়ার বিক্রি এখানে, কিন্তু ফ্যাক্টরি হচ্ছে ফরিদাবাদে।

কড়োরটিয়ার অফিসে সেদিন মালিক কর্মচারীর গোলমাল—কাজ হলো না। ওদের ম্যানেজার বললো, এই বেটি—জায়গায় ওরা আর ব্যবসা করবে না।

আপিসে ফিরে দেখা পাস্তলুর সঙ্গে। পাস্তলু এমনিতে বেশ দিলদরিয়া। সিগরেট দিয়ে বললে—কী খবর তুমার? (ও অল্প দিনের মধ্যেই বেশ বাংলা বলতে শিখেছে।) শরীর এতো খারাপ কেন? লুকিং ড্রাই এণ্ড ইমাশিয়েটেড। দেখো, তুমার ফ্ল্যাট আমাকে দাও। চৌরঙ্গী পাড়ায় তুমাদের থাকা পোষায় না। শ্যামবাজার চলে যাও।

রাজামুন্দ্রি থেকে মাইল তিরিশ ভেতরে এক গ্রামে পাস্তলুর বাড়ি। ওর বাবার বিড়ি-তামাকের ব্যবসা। দু বছর হলো কলকাতায় এসেছে ও।

পাস্তলুই নিয়ে গেলো কফি খেতে মাদ্রাজ রেস্তোরাঁয়। কফির নিন্দে করায় বয়টা বেমালুম বলে দিল কফির নিন্দে করা আমার পোষায় না। পাস্তলুর কী হাসি!

বাড়ি ফেরবার পথে পানির দোকানে গেলাম টুকটাকি ক'টা জিনিস কিনতে। সাবান, পেষ্ট, ভিম পাউডার, শেভিং ষ্টিক। সব কিছুরই দাম বেশি। সে-কথা কর্মচারীকে বলতে ভেতর থেকে শুনলাম পানির গলা: বংগালিরাই শুধু দাম-দর করে জিনিষের—খারাপ অভ্যাস!

সন্ধ্যেবেলায় ধোবি এলো—রামকঠিন, মালি এলো—নিশামনি, পালিসওলা—ইয়াকুব। ওদের পাওনা টাকা-পয়সা নিয়ে চলে যাবার পরে তলার ফ্ল্যাটের মিনচু এলো মাছের পাঁপড় নিয়ে তার আন্টিকে দিতে, সঙ্গে অন্য ফ্ল্যাটের মানসুখানির মেয়ে, রোশনি।

আমার স্ত্রী হিন্দি বলতে পারে না। মিনচু বললে—আন্টি, হিন্দি শিখ লো।

বললাম—মিনচু, তোমার বাবা—আহ কং—তো চমৎকার বাংলা বলে; তুমি বলো না কেন?

মিনচু হেসে বললো—বাবা যখন বাংলা শিখেছিল তখন তার প্রয়োজন ছিলো। এখন হিন্দি শেখার দরকার—আমি তাই বাংলা শিখছি নে।

মনে হলো কথাটায় যুক্তি আছে।

সারাদিনের ক্লান্তি আর অসহ্য গরমের হাত থেকে মুক্তির জন্যে গিয়ে ঢুকলাম 'সম্বর'-এ। ঠাণ্ডা ঘর, ঠাণ্ডা আলো, ঠাণ্ডা বিয়ার। একটা দুজনের টেবিলে যোশি বসেছিলো। দেখতে পেয়ে কাছে এলো। বললো, কাজ আছে, তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি। ওর সঙ্গীর কথা জিজ্ঞেস করায় বললো, ও ওর আগেকার দিনের পার্টনার, রায়—এখন ওর কর্মচারী। ও দোকান বন্ধ না হওয়া অবধি থাকবে। যোশির ব্যবসার এখন ভীষণ নাম—সপ্তাহে একদিনের জন্যে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যায় এখানে। তার বেশি টাইম দেওয়া সম্ভব নয়।

তিন বছর আগে যোশি কাপড় ফিরি করতো বাড়ি বাড়ি—স্যাটের কাপড়। আজ সে একটা কারখানার মালিক।

পাশের টেবিলে সাহিত্য-আলোচনা। চারটি তরুণ সমান উৎসাহে ও সমান গলার আওয়াজে তর্ক জুড়েছে। চারমিনারের কটু গন্ধে সমস্ত জায়গাটা বিষাক্ত। ধূমপানে আমার এমনিতেই এলার্জি, চিৎকারে ততোধিক।

সমস্ত টেবিল ভর্তি—উঠে যাই-ই বা কোথায়! ওদের বিমূর্ত আলোচনা ক্রমশঃ বিশেষ হতে লাগলো—হলো ব্যক্তিগত। অবশেষে—রাখো তোমার হলদে সবুজ ওরাং ওটাংয়ের কবিতা!

রাখ, তোর নীল বাঁদরের গল্প !···তোর মতো লেখককে আমি অনেক জন্ম দিয়েছি !....

নিশ্চয়ই মনোনিবেশ করেছিলাম ওদের আলোচনায়, না হলে চমকে উঠবো কেন সামনের চেয়ারে-বসা ছোকরার কথায়—দেখো ব্লাডি বেঙ্গলিরা কী রকম উল্লুক !···সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান ছোকরা; ডান হাতে ঘড়ি।

তোমার বাড়ি কোথায়? জিজ্ঞেস করি।

মহারাষ্ট্রে। ও জবাব দেয়।

আমার বাড়ি বাংলায়। বলি আমি।

হতে পারে। কিন্তু আমি আমার কথা উইথড্র করছি নে।

ছোকরার দিকে আরেকবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। চওড়া কবজীর হাড়, অন্তত চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। তবু সাহস করে তর্ক জুড়লাম। কী বলেছিলাম সব মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে আমার চিৎকারে ম্যানেজার ও আরো কয়েকজন ছুটে এলো, আর তর্ক থেকে নিবৃত্ত করালো আমাদের। বিল মিটিয়ে চলে যাচ্ছি, কে একজন মন্তব্য ছুঁড়ে মারলো—এখানেও প্যারোক্যালিজম্! সাব্বাশ !!

পাশের টেবিলের বঙ্গনন্দনেরা হো হো করে হেসে উঠলো।

॥ ওঙ্কার গুপ্তর রচনা সম্পর্কে গুটিকয় অভিমত ॥

এ-যুগের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'।…

ঘরে-বাইরে, আপিসে-মজলিসে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, রিসেপশনে-রেস্তোরাঁয় যে প্রবাহমান জনস্রোত দেখি, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের খাতিরে যে-সব লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে বা জাল ফেলে বসে আছে, তাদের চরিত্রের আর চর্য্যার…নিখুঁত ছবি।…এর যাথার্থ্য আর ভিতরকার সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।… লেখকের মন আছে, হৃদয় আছে, চোখ আছে আর কলমের জোর আছে।—**জাতীয় অধ্যাপক, ভাষাচার্য, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**

অনেকদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরামের যোগ্য উত্তর সাধক এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নিতে হবে।…রশুরামের নির্মম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী চাতুর্যের সঙ্গে ডিকেন্সীয় সেনস্ অব হিউমিলিটির শুভমিলন হয়েছে ওঙ্কার গুপ্তের রচনায়।—**আনন্দবাজার পত্রিকা।**

ওঙ্কার গুপ্ত এক বিরল শ্রেণীর লেখক, তাঁর চোখ আছে, ক্যামেরা-ধর্মী চোখ। প্রতিটি কাহিনীর অন্তরালে আছে এ-কালের বাঙ্গালী জীবনের হতাশা ও বিভ্রান্তির পরিচয়। সুনিপুণ শ্লেষ, সরস রসিকতা ও সুগভীর অনুভূতি এই লেখকের রচনায় পরিস্ফুট।

—**অমৃত**

বাংলা ব্যঙ্গ রচনার ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।—**দেশ।**

…প্রেমের উপন্যাসের এই দেশে সমস্ত পাঠকদের হাততালি পাবেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনি যে আমাদের দেশের এবং আমাদের সাহিত্যের উপকার করছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—শংকর।

প্রতিটি লেখাই এক একখানা চাবুক।—জনৈক পাঠক।

মুখোশ-খোলা মুখ

একদা পরশুরামের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন সাহিত্যের অঙ্গনে। রাজশেখর বসুর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, যোগ্য রচনার যোগ্য সমঝদারের অভাব তাঁর সময়ে হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞাপনের প্রচণ্ড সমারোহের এই যুগে ভেজাল ছাড়পত্রের কল্যাণে যখন অনেক জাল লেখকই সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং প্রকৃত সমালোচকের অভাবে পাঠকও সমালোচনায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, সে সময়ে 'এই তো ব্যাপার'-এর লেখককে যদি প্রাণ খুলে স্বাগত জানাই, তবে হয়তো অনেকেই চমকিত হবেন—ভাববেন উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক-কুলকে জানানো অনেকদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরামের যোগ্য উত্তরসাধক এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নিতে হবে।

সম্ভবত ছদ্মনামের আড়ালে গুপ্ত থেকেই গুপ্তমশায় আধুনিক সমাজের অনেক ফাঁক ফোকরের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। কলমের এক এক আঁচড়ে এক-একটা আস্ত চরিত্র উপস্থিত। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং আমাদের পরিচিত। এদের অনেককেই আমরা দেখেছি, ঈর্ষা করেছি, আবার ঠাট্টাও করি মাঝে মাঝে। কেউ বাঙালী, কেউ অবাঙালী, কেউ ঘটি, কেউ বাঙ্গাল, কেউ বিশাল ধনী, কেউ সামান্য করনিক মাত্র। কিন্তু সবাই ভণ্ডামির মুখোশ আঁটা, স্বার্থের দাস। কত সামান্য কারণেই মানুষ মিথ্যের আশ্রয় নেয়, প্রবঞ্চনা করে, আবার স্বার্থসিদ্ধ হলে উপকারীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিদায় নেয়। পেঁয়াজের পরতের পর পরত ছাড়ানোর মত করে লেখক প্রতিটি চরিত্রকে চিরে চিরে দেখিয়েছেন—অন্তঃসারশূন্যতার পরেই আজকের সমাজ তার বনিয়াদ গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে।

সমাজের পচনশীল অঙ্গের এই নিপুণ ক্লিনিক্যাল সার্জারীর জন্য লেখক নিশ্চয়ই পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাবেন। পরশুরামের নির্মম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী চাতুর্যের সঙ্গে ডিকেন্সীয় সেনস অব হিউমিলিটির শুভমিলন হয়েছে ওঙ্কার গুপ্তের রচনায়।

পরিশেষে প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্রের জন্য অলোক ধর অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। আঁকা যেন লেখার পরিপূরক। শ্রীযুক্ত ধরের আঁকার গুণে প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

এই তো ব্যাপার (২য় মুদ্রণ)
দাম : সাড়ে চার টাকা